যাত্রী

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাত্রী

প্রথম খণ্ড

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিযান

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
1266
LIBRARY.
13 12'53
Agartala.

অভিযান পাবলিশিং হাউস লিঃ
৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রকাশক—সুজন ঠাকুর
অভিযান পাবলিশিং হাউস লিঃ
৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫৭

মূল্য চারি টাকা

মুদ্রাকর—জিতেন্দ্র নাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিণ্টারস্ লিঃ
২—এ, গৌরলাহা ষ্ট্রীট—কলিকাতা-৬

যাত্রী

আমি যে পরিবারে জন্মেছিলুম সেটা আটপৌরে পরিবার ছিল না। এই পরিবারের জীবনযাত্রার নিজস্ব একটা সংস্কার ছিলো যেটাকে কোন প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। পূব পশ্চিম নিঃশব্দে অত্যন্ত সহজ ভাবে মিলে গিয়েছিলো আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আমার জন্মের এক শতাব্দীরও আগে। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের কোন চিন্তা, কোন অনুভূতিই এই বাড়ীতে অপাংক্তেয় ছিলো না। তিলক-কাটা নামাবলী-পরা চিন্তা ছাড়া আর সব বর্জনীয় এই ধরণের উগ্র সংকীর্ণতা এ বাড়ীর আবহাওয়াকে যেমন কখনো বিষিয়ে দেয়নি, ঠিক তেমনই সমুদ্রের ওপার থেকে যা কিছু এসেছে তার মূল্য যাচাই না করে নির্বিচার গ্রহণ, এই মেরুদণ্ডহীন চিন্তার ক্লীবত্ব এ বাড়ীর বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করে নি। ভারতবর্ষের বৃহৎ ধারণার সম্বন্ধে যেমন শ্রদ্ধা ছিলো, পাশ্চাত্যের বৃহৎ ভাব-সম্ভারের প্রতি তার চেয়ে কম শ্রদ্ধা ছিলো না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের মালাবদল ঘটে গিয়েছিলো জোড়াসাঁকো বাড়ীর প্রাঙ্গনে। দ্বারকানাথ

ঠাকুর অপরিমিত ধন সঞ্চয় করেছিলেন ধনসঞ্চয়ের মামুলী পন্থা ধরেই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কাছ থেকে নুনের ইজারা নিয়ে তিনি অগাধ ধনের অধিকারী হন। তারপরে নানান ব্যবসায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় আমরা পাই ইন্‌সিওরেন্স কম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। ইন্‌সিওরেন্স কম্পানীর কল্পনা ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম করেন। লক্ষ্মীর পদ্মের সোণার পাপ্‌ড়ি লুট করার নৈপুণ্যের মধ্যেই যদি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সব পরিচয় নিঃশেষ হোতো তাহলে অন্য ধনীর সম্বন্ধেও যেমন সত্যিকরে বলবার কিছু থাকে না তাঁর সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটতো। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে ধনসঞ্চয়ের প্রয়াসেই তাঁর জীবনের সব পরিচয় শেষ হয়ে যায় নি।

সমাজের সমস্ত কুসংস্কারের গ্লানি থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করবার কাজে তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের অন্যতম সাথী। সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনি রামমোহন রায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। শবচ্ছেদ যখন হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল তখন এই কুসংস্কার দূর করবার জন্যে যে হিন্দু শবচ্ছেদ করবে মেডিকেল কলেজে, তাকে অর্থ পুরষ্কার দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করেন। শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে তাঁর অকুণ্ঠিত দানের পরিচয় তখনকার প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে পাওয়া যাবে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে তাঁহার যাতায়ত ছিল। সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে প্রচলিত হিন্দু ধারণা তাঁকে বিচলিত করে নি।

তাঁর যুগের অবসানে যে যুগ সুরু হলো, সেই যুগে পারস্য-আরব্যের ইসলামীয় সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পদ

ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা, এই তিন সুগভীর চিন্তাধারার ত্রিবেণী সঙ্গম হলো জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এই তিন ধারার সমন্বয় আমরা দেখতে পাই। আমি যখন জন্মলাভ করি তখন জোড়াসাঁকো বাড়ীর সুর ছিলো দেবেন্দ্রনাথের নিজের হাতের বাঁধা সুর। সমস্ত বাড়ীটি ঘিরে ছিলো এক উদার দীপ্ত প্রশান্তি, তার সুর তখনও নেমে যায় নি। তখন প্রদীপের সল্‌তেকে উস্কে দিয়ে আলো জ্বালিয়ে রাখবার দরকার ছিলো না, প্রদীপের তেল তখনো তলানিতে এসে পৌঁছয়নি।

১৯০১ সালের অক্টোবর মাসে আমার জন্ম। আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথের পরে আমি বাড়ীর প্রথম ছেলে চার পাঁচ বোনের পরে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমার নামকরণ করেছিলেন। আমার জীবনের প্রথম স্মৃতি জড়িয়ে আছে বাড়ীর তে-তলার ছাদের সঙ্গে। অস্পষ্ট ছায়ার মত চোখে ভাস্‌ছে এক ধব্‌ধবে মূর্তি, শাদা দাড়ি, বসে আছেন এক বড় চৌকিতে, আর মনে পড়ে ছাদের উপর রিক্সয় ঘুরছেন এক বুড়ো, খুব অস্পষ্ট মনে আছে যে মাঝে মাঝে আমিও যেন তাঁর সঙ্গে রিক্সয় ঘুরেছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় আমার বয়স চার বৎসর। আমার স্মৃতির মঞ্জুষায় তাঁর সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী আর কিছু নেই। বাড়ী তখন লোকজনে ভরা। বৈঠকখানা ঘরে জ্যাঠামশায় দ্বিপেন্দ্রনাথের মজলিস। কত রঙবেরঙের লোক সেখানে আসতো। একটি লোককে মনে পড়ে, নাম ছিল বক্‌সী। কলকাতার কোন এক গীর্জের পাদরী ছিল। জ্যাঠামশায় কেমন করে তাকে সংগ্রহ করেছিলেন তা' জানিনে। শুনেছিলুম

যে একবার গীর্জেতে উপাসনার সময় জ্যাঠামশায় হঠাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। জ্যাঠামশায়কে দেখে বক্‌সী প্রভু বলে সম্বোধন করে কি জানি বলেছিল। তাতে তার কাজ যায়। এক থালা লঙ্কা খাওয়া, বুনো ওল কাঁচা খাওয়া এই সব ছিল বক্‌সীর খেলা। বৈঠকখানায় প্রসিদ্ধ গায়ক রাধিকা গোস্বামী মশায়, শ্যামসুন্দর মিশ্র প্রভৃতি গায়কদের মজলিস রোজই বসতো। তেতলার ঘর যেখানে মহর্ষি থাকতেন সে ঘরে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। একতলার ঘরে আমার পিতা সুধীন্দ্রনাথের বসবার ঘর ছিল। তখনকার কালের যত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সবাই ছিলেন পিতার বন্ধু। তাঁর ঘরে কবি দেবেন্দ্র-নাথ সেন, কবি করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রভৃতি বহু সাহিত্যিকদের সমাবেশ হতো। ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে আমার পিতা ছিলেন অন্যতম। তাঁর 'কাশিমের মুর্গী'র মত অনবদ্য ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যে খুবই কম। গল্প লেখা হলেই তিনি আমাদের ভাইবোনদের পড়ে শুনাতেন। এবাড়ীর ওবাড়ীর সব ছোট ছেলেমেয়েদের বন্ধু ছিলেন তিনি। অহঙ্কার তাঁর জীবনকে কখনও স্পর্শ করেনি। শাদা কট্‌কি চটি, শাদা চাদর ধুতি এই ছিলো তাঁর বেশ। কথা ছিলো স্নিগ্ধ, সকলের সঙ্গে আচরণ ছিলো উদার মাধুর্যে ভরা।

কেউ গরীব বলে তার উপর অন্যায় হবে, অবিচার হবে এ তিনি কখনও সহ্য করতে পারতেন না। বাড়ীর চাকর দাসীদের উপর আমাদের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। মনে পড়ে আমার বয়স তখন আট নয় বৎসর হবে। ঝিল্লু

নামে একজন পশ্চিমী লোক বহুকাল থেকে আমাদের বাড়ীতে কাজ করত। তার কাজ ছিলো সন্ধ্যেবেলা ঘরে ঘরে লণ্ঠন দিয়ে যাওয়া আর বাবুদের তামাক সেজে দেওয়া। সেকেলের দস্তুর মত তাকে ঝিল্লু ফর্‌াস বলে ডাকা হোতো। ঝিল্লুর ছোট ছেলে ছিল আমার চেয়ে দু এক বছরের ছোটো। একদিন দুপুরে দুষ্টুমি করে ফেলে দিয়েছিলুম তাকে আমাদের বাগানের ধারের চৌবাচ্চায়। সে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার পিতার কাছে নালিশ করলো, আমাকে এক ঘণ্টা কোণে দাঁড়াতে হলো এই দুষ্টুমির জন্যে। গরীব বলে তার উপর এই ব্যবহার হয়েছে পাছে সে এই কথা মনে করে এই জন্যে পিতার সঙ্কোচের অবধি ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আমল থেকেই আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে কখনো নকলনবিশী সাহেবিয়ানা ঢুকতে পায় নি। কলকাতার সমাজের উপরের তলার শিক্ষিত পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে তখন সাহেবিয়ানা আর বিবিয়ানা ঢঙের জোয়ার বইছে। বাঙলা ভাষায় কথা বলা, চিঠি লেখা, বাঙালী বেশভূষা তখন এদের কাছে অচল ছিলো। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের এই আত্মমর্যাদাহীন কলুষের ঢেউ আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ীর ফটক পার হতে পারে নি। দেবেন্দ্রনাথের এক আত্মীয় তাঁকে ইংরেজীতে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠি তাঁর কাছে ফেরৎ গিয়েছিলো। আমার ছেলেবেলা সেই আবহাওয়াতেই কেটে গেছে। মনে পড়ে তখন আমার বয়েস ছ'সাত হবে একবার আমার কাকা ঋতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ময়দানে বেড়াতে যাই। বাড়ী ফেরবার পথে তিনি হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্‌ল কম্পানীর দোকানে নিয়ে গিয়ে আমাকে কোট প্যাণ্ট কলার টাই পরিয়ে বাড়ী

নিয়ে আসেন। আমি তো মহা খুসি, দৌড়ে গেলুম পিতার কাছে নতুন সাজ দেখাবার জন্যে। তিনি আমার গলা থেকে কলার টাই খুলে ফেলে দিলেন, বললেন,—কখনো এসব পরবে না। তখন ছেলেমানুষ ছিলুম, কান্নাকাটি বাদ পড়েনি সেদিন, কিন্তু সেই আমার জীবনের প্রথম আর শেষ সাহেব সাজা। বাড়ীতে আসতেন বৃদ্ধ জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মশাই দালানে প্রাত্যহিক উপাসনার জন্য। পিতার আদেশে রোজ সকালে আমাকে ব্রাহ্মধর্ম আর মহাভারত পড়তে হতো তাঁর কাছে।

খুব শিশু বয়েস থেকে আমি গান গাইতে পারতুম। আমার মা ভালো গাইতে পারতেন, পিতার গানের গলা ছিলো না কিন্তু খুব সুর বোধ ছিলো আর তাঁর বাজনার হাত ছিলো খুব মিষ্টি। বাড়ীতে থিয়েটারের সময় গানের সঙ্গে তিনিই বাজাতেন অর্গান কিম্বা পিয়ানো। বাড়ীতে তখন গানের জোয়ার বইতো ভিতরে বাইরে। আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথ আর দিদি রমা দুজনেই খুব ভালো গাইতেন। আমি যে কবে গান জানতুম না, বাজাতে জানতুম না সেটা আমার মনে নেই। এক এক দিন ভোর বেলা ঘুম ভেঙ্গে খাটে উঠে বসতেই মা আমাকে এ ব্রহ্ম সঙ্গীত ও ব্রহ্ম সঙ্গীত গাইতে বলতেন। মশারির মধ্যে বসেই আমাকে গাইতে হতো। খুব ছোটো বেলাকার গানের মধ্যে 'তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে', 'অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি', 'করো তাঁর নাম গান', গানগুলি আজো কানে বাজছে।

রাধিকা গোস্বামী মশায় আমার দিদি রমাকে গান শেখাতেন। আমার বয়েস তখন পাঁচ বৎসর হবে। আমি শুনে শুনে গান

শিখতুম। তার কিছুদিন পরে ওস্তাদ শ্যামসুন্দর মিশ্রের কাছে গান শিখতুম আমি আর আমার দিদি।

আমার বয়েস তখন পাঁচ বৎসর হবে, মনে পড়ে বাড়ীর উঠোন ভরে গেছে লোকে, আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথ মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, গায়ে আলখাল্লা, আমাকে তাঁর কাঁধে বসিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গান ধরেছেন—'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি', বাঙলার মাটি বাংলার জল'। আমি তাঁর কাঁধের উপর বসে গাইতুম তাঁদের সঙ্গে। স্বদেশী যুগের যে স্মৃতি মনে আছে তার মধ্যে এই গানের স্মৃতিই জ্বল্‌জ্বলে হয়ে আছে। রাখীবন্ধনের দিনে চিড়ে দইয়ের ফলার খেতুম আমরা। রাখী-বন্ধনের কথায় মনে পড়ে গেলো যে ১৯১০ সালে গিরিডিতে থাকবার সময় আমি আর আমারই সমবয়েসী আরো দুতিন জন মিলে আমরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হাতে রাখী বাঁধতে গিয়েছিলুম। এক মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমরা রাখী বেঁধে বিদায় হলুম। দিশী কাপড় পরা, দিশী জিনিষ ব্যবহার করা এটা আমাদের বাড়ীর বহুদিনের রেওয়াজ। স্বদেশী যুগের অনেক আগে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ, রবীন্দ্রনাথ আর আমার এক কাকা বলেন্দ্রনাথ দিশী জিনিষ তৈরী করবার জন্যে অনেকবার চেষ্টা করেছেন। আর্থিক ক্ষতির বোঝাতো তাঁদের বহন করতে হয়েছিলোই, দেশের লোকের অবজ্ঞা ও উপহাস সে ক্ষতির বোঝাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিলো। আমাদের একটা গ্রামোফোন ছিলো সেটাকেও বিক্রী করে তার টাকা দিয়ে দেওয়া হলো স্বদেশী ফণ্ডে। আমার এক মামা চলে গেলেন আহমেদাবাদে কাপড়ের কলে কাজ শেখবার জন্যে।

যাত্রী

আমি তখন নেহাৎ শিশু, তবুও শিশুর সব-দেখা সব-ছোঁওয়া মন দিয়ে আমি বাড়ীর আবহাওয়া থেকে স্বদেশী যুগের বিদ্যুৎ-বহ্নির স্পর্শ নিয়েছি। আমাদের পরিবারের সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিলো। প্রায়ই মায়ের সঙ্গে আমরা কলেজ স্কোয়ারে তাঁদের বাড়ীতে যেতুম। সেইখানেই অরবিন্দকে আমি প্রথম দেখি। টেবিলের সামনে চৌকিতে তিনি বসে ছিলেন, গায়ে কালো কোট। আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতে বল্লেন, একটা গান গাওতো। আমি গান শোনালুম। আর আমার কিছু মনে নেই। সঞ্জীবনী আপিসেই আমি তাঁকে দু' চারবার দেখেছি। তারপরে আর একবার মাত্র আমি অরবিন্দকে দেখি সে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। বিপিন পাল আর অরবিন্দ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমার বয়েস তখন ছ'সাত হবে। বড়োরা বলাবলি করছিলেন যে বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ এসেছেন। তাঁদের আসার মানে বোঝবার বয়েস তখন আমার হয় নি। মা'র মুখে এঁদের নাম প্রায়ই শুনতেম, তাই বালকের কৌতূহল ছিল এঁদের দেখবার জন্যে। ফটকের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলুম এঁদের দেখবার জন্যে। সন্ধ্যের সময় এরা এসেছিলেন, ফটকের পাশে একতলার উত্তরের ঘরে এঁদের কথাবার্তা চলছিলো। রবীন্দ্রনাথ এঁদের নিয়ে যখন বের হয়ে এলেন তখন দেখলুম।

আমাদের বাড়ীতে বিলিতি কাঁচের বাসন তখন ভেঙ্গে ফেলা হলো। দিশী নুন, দিশী কাপড়, দিশী কাঁয়চি, ছুরি নানা রকম দিশী জিনিষ আমাদের বাড়ীতে এসে ঢুকলো। মা রোজ খবরের কাগজ পড়তেন তাঁর মুখ থেকে শুনতুম স্বদেশী

আন্দোলনের কথা। মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যেবেলা আমাদের ঘরের সামনে দক্ষিণের বারাণ্ডায় বসে আছি মা'র সঙ্গে, দূর থেকে বন্দেমাতরম ধ্বনি আস্‌ছে। মা বল্লেন, বিপিন পাল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, তাঁকে নিয়ে শোভাযাত্রা হচ্ছে। কানাই, বারীন, সত্যেন এদের কথা মা'র কাছে থেকেই শুনতুম। কানাই, ক্ষুদিরাম আর সত্যেনের ফাঁসীর খবর বের হলে আমাদের অরন্ধন হলো ঘরে। বাড়ীতে কিছুদিনের মত অন্য সব গান যেন তলিয়ে গেলো। 'বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জল', 'সোনার বাঙ্গলা', 'সার্থক জনম আমার', 'ও আমার দেশের মাটি', 'হে ভারত আজি তোমার সভায়', 'বাঙ্গলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি', 'এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে', 'আপনি অবশ হলি', এসব গান আমাদের ভাই বোনদের মুখে মুখে ফিরতো। মাও এসব গান গাইতেন, আমি তাঁর মুখ থেকে শুনে শিখেছি, শিখবো বলে তোড়জোড় করে গান শেখার দুঃখ আমার প্রায় কখনই পেতে হয়নি। দু একবার শুনলেই সুর বসে যেত মনে, সে সুর আজ যখন গানের সঙ্গে আড়ি হয়ে গেছে তখনও ভুলিনি। এরি সঙ্গে মনে আছে আরো দুটি গান, আমি আর আমার দিদি রমা খুব গাইতুম; 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই', আর অন্যটির দুএকটি লাইন মনে আছে; 'ক্ষুদিরাম গেলো হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতে করিয়া জীবন শেষ'।

এমনি করে সেই স্বদেশী যুগের আবহাওয়ায় আর আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ীর একটি বিশেষ ভাবধারার পরিবেষ্টনীর মধ্যে আমার জীবন তার প্রাণরস টেনে নিয়েছিলো। একান্ত সহজ ভাবে দেশের উপর টান আমার সমস্ত হৃদয়াবেগকে অনুরঞ্জিত

করেছিলো, সেটা উপর থেকে আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বাড়ীর আলো বাতাসে আমার জীবন অত্যন্ত সহজ ভাবে দেশকে ভালবাসতে শিখেছিলো। যখনই খবরের কাগজে খবর বের হতো যে কোথাও বোমা পড়েছে মনটা খুসি হয়ে উঠ্‌তো। ইংরেজ-বিদ্বেষ মনে থিতিয়ে বসেছে তখন, ইংরেজ দেখ্‌লেই মনটা বিষিয়ে উঠ্‌তো। ন'দশ বয়সের একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমার মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে চৌরঙ্গী দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি। এক ইংরেজ আসছিল, ইচ্ছে করে তার গায়ে ধাক্কা দিলুম। সে হাতের ছড়ি তুলে আমাকে মারতে এলো। মাষ্টার মশায় তার কাছে কি বল্‌লেন ইংরিজীতে বুঝলুম না, বুঝলুম এইটুকু যে ক্ষমা চেয়ে আমাকে মারের হাত থেকে বাঁচালেন। এই অত্যন্ত ছেলেমানুষি ঘটনার উল্লেখ করলুম শুধু এই জন্যে যে আমার ন'দশ বয়সের মনের ধারাটা কোন দিকে বইছিলো তারি আভাস এর থেকে পাওয়া যায়।

আমাদের বাড়ীতে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিলো এগারই মাঘের উৎসব, ৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু-বার্ষিকী, ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষা গ্রহণের দিন সকালে দালানে উপাসনা আর ১লা বৈশাখের সকালে উপাসনা আর কাঙালী বিদায়। এগারোই মাঘটাই ছিলো বাড়ীর প্রধান উৎসব। পৌষের শেষাশেষি থেকেই বাড়ীতে গানের আসর বসতো। তখন ওস্তাদদের দিয়ে গান গাওয়ানোর রেওয়াজ ছিলো। গানের আসর বস্‌তো বৈঠকখানা ঘরে। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে এসে বস্‌তেন। আমি সন্ধ্যে থেকে সেই যে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসতুম, গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠতুম না।

যাত্রী

একবার এগারোই মাঘে আমি অনেকগুলো গান গাইলুম। সে বৎসরের গানগুলোর মধ্যে ছিলো 'এক মনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা', আর 'তুমি যতো ভার দিয়েছো সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা'। রবীন্দ্রনাথ আর আমি দুজনে 'তুমি যত ভার দিয়েছ' এই কীর্তনটি গাই। তখন আমার বয়স সাত আট বছর হবে। সেবার মাঘোৎসবের গানের ধারা বেয়ে এক জন এসে পৌঁছলেন আমার বাল্য-জীবনের ঘাটে। মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ আর আমি গান গাইবার কয়েক দিন পরে আমার পিতার কাছে একটি চিঠি এলো। পত্রলেখক জানান যে তিনি আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন, দেখা করতে আসতে চান। একদিন সন্ধ্যে বেলা এক ভদ্রলোক এলেন, শুনলুম তাঁর নাম নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, কলকাতায় শিক্ষকতা করছেন, বাড়ী তাঁর বহরমপুরে। সেই সন্ধ্যের আলাপ থেকে এমন একটি আত্মীয়তার সৃষ্টি হোলো যা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিলো। একতলার দক্ষিণের ঘরে তক্তপোষের উপর ঢালা ফরাসে আমাদের আসর জমতো। ঝড়ই হোক আর আমাদের জোড়াসাঁকোর গলি পুকুরই হোক, রোজ সন্ধ্যেবেলা নলিনীবাবু এসে হাজির হতেন। আমার বাল্যের হেফাজৎকরণেওয়ালা রামলাল বেহারা বরাদ্দ চা আর কাটলেট এনে হাজির করতো নলিনীবাবুর জন্যে। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে কপালের উপরের একটি চুলের গুচ্ছ অনবরত দুটি আঙুল দিয়ে নাড়া-চাড়া করতেন তিনি। কিছুক্ষণ পড়বার পরেই খেলবার জন্য আব্দার ধরতুম। বই খাতা ফেলে দিয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে

যেতুম বারাণ্ডায়, চোর চোর খেলতুম তাঁর সঙ্গে। গরমের ছুটিতে যখন তিনি বহরমপুরে যেতেন তখন সেখান থেকে তাড়া তাড়া গল্প লিখে পাঠাতেন আমাকে। তিনি ছিলেন বাড়ীর সব ছেলেমেয়েদের বন্ধু। পকেটে ভরা থাকৃতো নানা খামে নানা দেশের ডাক টিকিট আর জলছবি। আমার ভাইরা, ভাগ্নেরা সবাই তাঁর দাক্ষিণ্য লাভ করতো। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ্—ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী এই ভাষাগুলিতে তিনি এম, এ, পাশ করেন। এম, এ, পাশ করা তাঁর নেশার মধ্যে ছিলো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরিজীর অধ্যাপনা করতেন। গত মহাযুদ্ধের সময় আমি যখন ফতেগড় জেলে আটক তখন পেলুম তাঁর মৃত্যুর খবর। এগারোই মাঘের ক'দিন আগে থেকেই আমাদের ভাইবোনেদের উৎসাহের আর অন্ত থাকতো না। বাড়ী চুনকাম হচ্ছে তাই দেখছি হাঁ করে দাঁড়িয়ে। মহর্ষির আমলের বুড়ো সদামালীর উপর ভার ছিলো উঠোন সাজাবার। দশই মাঘ বিকেল থেকে সদামালী অন্য মালীদের নিয়ে লেগে পড়তো সাজানোর তোড়জোড় করতে। আমরা তার পিছনে পিছনে ঘুরতুম। মাঝে মাঝে তার কাছে ধমকও যে খেতুম না তা নয়। তখন ইলেট্রিক আলোর দিন আসেনি। উঠোনে গ্যাসের আলো জ্বলতো আর দোতলার বারাণ্ডা থেকে ঝাড়ের লণ্ঠন ঝুলতো প্রত্যেক খিলেনের মধ্যে মধ্যে। বুড়ো শ্যামবাবু কনট্রাক্টর তাঁর আধমরা ছোট্ট একটি ঘোড়ায় টানা টম্‌টমে চড়ে আসতেন গ্যাসের লাইন ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য। তাঁর চেহারাটা বেশ মনে পড়ছে। বুক থেকে ভুঁড়ি নেমে গেছে, মাথায়

যাত্রী

কাঁচাপাকা চুল, পাকার ভাগই বেশী, গোঁফ জোড়া বেশ নজরে পড়বার মত, ভারী গলার আওয়াজ। মহর্ষির আমল থেকেই তিনি নিযুক্ত ছিলেন এই কাজে। দালানের পেছনে গোলা-বাড়ীতে থাকতো বুড়ো কুঞ্জ, সে পঞ্চাশ বছরেরও উপর আমাদের বাড়ীতে কাজ করেছে। তার কাজ ছিলো এগারোই মাঘের উৎসবের দিনে মেঠাই তৈরী করা। মহর্ষির আমলে মেঠাই তৈরী হতো এক একটা ফুটবলের মত। এগারোই মাঘ রাত্রে যাঁরা আসতেন সকলকে পাত পেড়ে খাওয়ানো হতো। আমাদের সময় পাত পেড়ে খাওয়ানো উঠে গিয়েছিল, সকলকে মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার খাওয়ানো হতো। দশই থেকে কুঞ্জ মেঠাই তৈরী করতে স্ুরু করতো গোলা বাড়ীতে আর আমরা লেগে থাকতুম তার পিছনে। সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতুম কুঞ্জর দিকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে থাকবার পর একটা মেঠাই দিয়ে সে ভাগিয়ে দিতো আমাদের। দশই মাঘ রাত্তিরে আর ঘুমই হতো না ভালো করে। অন্ধকার থাকতে থাকতে কোন্ ভোর থেকে সানাই বাজতে স্থুরু করতো এগারোই মাঘ সকালে। সকালের উপাসনা হতো আদি ব্রাহ্মসমাজে, আমরা দারোয়ানের সঙ্গে যেতুম, মা'রা পাল্কী করে যেতেন। দুপুরেই উঠোনে সামিয়ানা খাটানো হয়ে যেতো, দালানে আর উঠোনে চৌকি সাজানো স্থুরু হতো আর আমরা চৌকির মধ্যে দিয়ে দৌড়ে বেড়াতুম। এগারোই মাঘের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে লালবিহারী বড়াল মহাশয়ের কথা। এগারোই মাঘ সকালেই তিনি এসে উপস্থিত হতেন চুঁচড়ো থেকে, হাতে কার্পেটের ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে থেকে

গোলাপ ফুল বের করে প্রত্যেকের হাতে দিতেন। আমরা ছোটোর দলও তাঁর দাক্ষিণ্য থেকে বাদ পড়তুম না। সন্ধ্যে ছটার সময় উৎসব সুরু হতো কিন্তু পাঁচটা থেকেই সুরু হতো লোক আসতে। এগারোই মাঘের উৎসবে যোগ দেবার জন্যে তখন অসম্ভব ঔৎসুক্য ছিলো সাধারণের মধ্যে। হাজারেরও বেশী লোক জমা হতো। উঠোনে দালানে দোতলার বারাণ্ডায় লোক ধরতো না, দেউড়ির ভিতরেও চলা যেতো না লোকের ভীড়ে। রবীন্দ্রনাথ আচার্যের আসন গ্রহণ করতেন। আগে আমার পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথ আচার্যের আসন গ্রহণ করতেন, আমার আব্ছায়া মনে আছে একবার এগারোই মাঘের উৎসবে আমি যেন তাঁকে দেখেছিলুম আচার্যের আসনে।

উৎসব ভেঙ্গে যেতো, আমাদের উৎসব কিন্তু তখনও শেষ হোতো না। ঝাড় লণ্ঠন থেকে মোমবাতি সংগ্রহ করা আর উঠোন থেকে ফুল আর পেরেক যোগাড় করা এই ছিলো আমাদের খেলা। যতক্ষণ না শোবার ডাক পড়তো আমরা উঠোনেই ঘোরাফেরা করতুম।

বাড়ির দক্ষিণে বাগান ও ছাদ—এই ছিলো আমার রাজত্বের এলাকা। বাগানের পশ্চিম দিকে ছিলো বিরাট সিসু গাছ, পূবের পাঁচিলের কোনে লট্কান গাছ আর দক্ষিণে রেলিংয়ের ধারে কণক চাঁপার গাছ। তা'ছাড়া নানা ফুলের গাছে বাগান ছিলো ভরা। ম্যাগ্নোলিয়ার গাছ ছিলো অনেক, ম্যাগ্নোলিয়া ফুলের উপর আমাদের খুব লোভ ছিলো, কুঁড়ি ধরেছে কিনা দেখতুম আর তার পরে সদামালী আর ঈশ্বরমালীর কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করে ফুল যোগাড় করতুম। দুপুর

যাত্রী

বেলাটাই ছিলো আমার বাগানে বেড়াবার সময়। মা খাওয়া দাওয়া সেরে দক্ষিণের ঘরে শুয়ে বই পড়তেন, পিতা তাঁর একতলার দক্ষিণের ঘরে কৌচে শুয়ে ঘুমতেন। আমি পিতার ঘরের সামনের বারাণ্ডা দিয়ে একদৌড়ে চলে যাবার সময় দেখে নিতুম তাঁর দুটি পা কৌচের গায়ে তুলে তিনি ঘুমচ্ছেন কিনা! তার পরে আমায় পায় কে! সিসু গাছের তলায় বড়ো বড়ো পাতাওয়ালা কি একটা গাছ ছিলো, সেই গাছের পাতা জুড়ে টুন্‌টুনি পাখী বাসা বাঁধতো, আমি সেই পাতার দরজা ফাঁক করে বাসার মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতুম। টুন্‌টুনি পাখীগুলো আপত্তি জানিয়ে গণ্ডগোল সুরু করতো কাছের ঝোপ থেকে, বাচ্চাগুলো দুএকবার মাথা তুলে আবার এলিয়ে পড়তো। কতবার যে ঘুরে ফিরে টুন্‌টুনি পাখীর বাসায় উঁকি মারতুম তা বলা যায় না। বাগানের ভিতরটা ঝল্‌মল্‌ করতো রোদে, গাছ থেকে গাছে উড়ে যেতো ফড়িং আর প্রজাপতি। বাগানের দক্ষিণে মদন চাটুয্যের গলি দিয়ে কাঁসারি ঢং ঢং করে কাঁসা বাজিয়ে ফিরতো, চুড়িওয়ালা 'চুড়ি চাই' হেঁকে চল্‌তো। ও বাড়ীর বাগানে পাঁচিলের ধারে নারকেল গাছগুলোর মাথায় বসে চিলের দল তাদের কড়া ডাকের ছুরি দিয়ে দুপুরের রোদটাকে যেন চিরে ফেলতো দু' টুক্‌রো করে। বাগানটা আর বাগানই থাকতো না আমার কাছে। তার পাঁচিল রেলিং কোথায় যেন সব মিলিয়ে যেতো। সমস্ত বাগানটা হয়ে উঠতো যেন রূপকথার তেপান্তরের মাঠ। সেই মাঠ দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে চলতো মন কতো নদনদী পার হয়ে ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীর দেশ। বিশেষ করে যে

কিছু ভাবতুম তা নয়, সমস্ত শরীর মনকে কে যেন বেঁধে দিতো রূপকথার সুরের পর্দায়। আজও সেই বাগানে কথা যখনই মনে পড়ে তখনই দুপুরের রোদের রঙে আঁ একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। লটকান্ গাছের ফলগুলো পেকে উঠলেই ধূম পড়ে যেতো আমাদের কাপড় রঙাবার, হাতের তেলো লটকানের রঙে রঙীন থাকতো এই সময়ে। আজও আমার লটকানের উপর পক্ষপাতিত্ব যায় নি, ওর গন্ধ আর রঙ একটা বিশেষ টানে মনকে টানে।

দেউড়িতে বসে বুড়ো তুলসীরাম দরোয়ান রয়েল রীডার নম্বর ফোর পড়ে যেতো। আমার বাবা কাকারা যখন ইস্কুলে পড়তেন তখন থেকে তুলসীরাম রয়েল রীডার পড়া সুরু করেছিলো, আমি যখন ইস্কুলে পড়ি তখনও তার রয়েল রীডার পড়া শেষ হয় নি। ফুরসৎ পেলেই সে বস্তো রয়েল রীডার নিয়ে আর খোকাবাবুকে দেখলেই ধরে বসতো সে মানে বুঝিয়ে নেবার জন্যে। তার মাথায় একটু ছিট ছিলো, আমরা তাকে ক্ষেপিয়ে অস্থির করতুম। হুপ্পালাল দরোয়ান, সেও পুরণো লোক, দুপুর বেলা দেউড়ির রোয়াকে শুয়ে ঘুমতো। লম্বা, রোগা লোক ছিলো হুপ্পালাল, গলায় সোনার কণ্ঠী, মাথায় পাগড়ি, লাল আর হলদেতে মেশানো হাঁটু পর্য্যন্ত ঝোলানো উর্দি গায়ে। তার কথা বলবার একটা বিশেষ ঢঙ ছিলো। ডান কানের উপর ডান হাতটা বেঁকিয়ে রেখে 'জি হজুর' বলে সে বেঁকে দাঁড়াতো। সেই আগেকার কালের আদব কায়দার রেশ থেকে গিয়েছিলো তার মধ্যে।

দোলের দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দরোয়ানদের হোলির গানের আসর বস্তো ফটকে। কতো বাড়ীর কতো

দরোয়ান এসে সেই আসরে জুট্‌তো। সকাল থেকে সিদ্ধির সরবৎ তৈরী হতো দেউড়ীতে চিটে গুড় দিয়ে, বড়ো বড়ো বাল্‌তিতে থাকতো ভরা, যে আসতো সেই আধ ঘটি এক ঘটি খেতো। ছুপ্পালাল থালায় আবীর নিয়ে ঘরে ঘরে দিয়ে যেতো আর পেতো হোলির বক্‌শিশ্‌।

আমরাও দোল খেলতুম প্রতি বৎসর। ও বাড়ীর বাগানে লতা-ঢাকা চায়ের ঘরে বসতো আমাদের ছেলেদের আড্ডা। আমাদের বন্ধুরা এসে জুট্‌তো, গাইতুম আমি হোলির গান আর আমার জাঠতুতো ভাই নবেন্দ্র নাচ্‌তো। বাড়ীর মধ্যে মেয়েরাও দোল খেলতেন। একবার মনে আছে আমার মেজদিদিমা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, ১৯নং ষ্টোর রোডের বাড়ীতে দোল খেলবার নেমন্তন করেছিলেন সকলকে। সেবার তিন পুরুষের দোলখেলা হয়েছিলো ১৯নং ষ্টোর রোডের বাড়ীর বিরাট বাগানে। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ, নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ, মেজদিদি জ্ঞানদানন্দিনী এঁদের দল, তারপরে বাবা, কাকা, মা কাকীদের দল আর আমাদের ভাই বোনদের দল। কোথায় গেলো সেই ১৯নম্বরে বাড়ী, পুকুর আর সেই বাঁধানো বকুল-তলা! আজ ধনী মারোয়াড়ীর কবলে সেই বাড়ী শেয়ার বাজারের রুচির পেষণে আর্তনাদ করছে!

একতলার দক্ষিণের যে ঘরে বসতেন আমার পিতা সেই ঘরে থাকতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ পুত্র সোমেন্দ্রনাথ, আমাদের সোমদাদা। পুরণো কতো গান যে গাইতেন তার অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার বই 'বনফুল' তিনিই ছাপান। রবীন্দ্রনাথের বাল্যের লেখা অপ্রকাশিত দু'তিনটি কবিতা তাঁর

মুখেই শুনেছিলুম। তখন লিখে নেওয়ার কথা মনে হয় নি, তাঁর সঙ্গেই সে কবিতাগুলো লোপ পেয়েছে। আমি ছিলুম তাঁর আদরের নাতি। ঘরের একধারে তাঁর খাট থাকতো, প্রায়ই শুয়ে থাকতেন। মাথায় মাখতেন ফুলন তেল, বালিশে সেই মিঠে তেলের গন্ধে 'পিঁপড়ে এসে জুটতো। আমিও তার পাশে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে তাঁর গল্প শুনতুম। তাঁর গায়ের রঙ ছিলো চাঁপা ফুলের মত, হাতের তেলোয় যেন ডালিম ফুলের রঙ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহুপূর্বে তিনি হাসির গান রচনা করেন। দুএকটি গানের লাইন কিছু কিছু এখনো মনে আছে। একটি ছিলো ঃ

ব্রাদার হে তোমার
যদি উড়তে ইচ্ছে হয় একবার,
তবে রঞ্জিকা গঞ্জিকা দিয়ে
তার সঙ্গে ভাঙ মিশায়ে
টেনো একবার, ব্রাদার ছেড়ো একবার।

আর একটা পান গাইতেন :

ওহে বিধু ভট্ট
রেগোনা চট্ট,
তোমার একি ব্যবহার !

এই বিধু ভট্টাচার্যটি যে কে তা' আমার জানা নেই।

সন্ধ্যেবেলা তাঁর ঘরের আর এক কোণে তক্তপোষের উপর মোমের বাতি জ্বেলে আমি পড়তুম। আমার পিতা মোমের বাতির আলো ছাড়া অন্য কোন আলোতে পড়তে দিতেন না। তাঁর ধারণা ছিলো অন্য আলোতে পড়লে চোখ খারাপ হয়।

সব ঘরে ঘরে সোমদাদার যাওয়া ছিলো, বৌরা, নাতি নাত্নী, নাতবৌরা যে যখন ধর্তো তখনই তিনি গান শোনাতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের গানগুলি, রবীন্দ্রনাথের গান, নিধুবাবুর টপ্পা তাঁর বহু জানা ছিলো। ১৯২০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, জোড়াসাঁকোর বাড়ীর এক তলার সেই দক্ষিণের ঘরের ঝরণাতলা শুকিয়ে গেলো।

মনে পড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বড় মেয়ে আমাদের বড়দিদি সৌদামিনীর কথা। ছোট্ট মানুষটি ছিলেন, একবারে সাদা পাথরের মত রঙ। একটা পাটকিলে রঙের কাবুলী বেড়াল ছিলো তাঁর বড় আদরের আর ছিলো তাঁর বহুদিনের পুরোণো চাকর ব্রজ। ব্রজ ছিলো যেমন কাজের তেম্নি মেজাজী। রেগে গেলে নিজের মনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে সে ঘুরতো ঘরের মধ্যে। আমরা তো ভয় পেতুমই, এমন কি বড়দিদিও তাকে সমীহ করে চলতেন। প্রতিদিন সকালে সাতটার সময় ঘণ্টা বাজতো, শাঁক বাজতো, ঠাকুরদালানে উপাসনার সময় হতো। বৃদ্ধ জ্ঞান ভট্টাচার্য মশায় রোজ উপাসনা করতেন আর তাঁর মৃত্যুর পরে করতেন শিরোমণি মশায়। বড়দিদি রোজ সকালে আমাকে নিয়ে যেতেন উপাসনা করতে। ছ'ই মাঘ মহর্ষির মৃত্যু-বার্ষিকীতে সকাল বেলা দালানে পিতার শ্রাদ্ধ উদ্‌যাপন করতেন বড়দিদি। চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল ঝরে পড়তো; চোখের কোণ মুছ্তে মুছ্তে আসতেন তিনি। মহর্ষির মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁর সেবা শুশ্রূষা সবই করেছেন বড়দিদি। সন্ধ্যে বেলা নিয়মিত পায়চারি করতেন উত্তরের বারান্দায়, কোনো কোনো দিন হঠাৎ তাঁকে দুই হাতে উঠিয়ে নিয়ে বারান্দার এক কোণ

থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত দৌড়তুম। হাল্কা ছিলেন যেন শোলা। নবান্নের দিনে নবান্ন তৈরী করে ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দিতেন বড়দিদি। ভাইফোঁটার দিন সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ যেতেন বড়দির ঘরে ভাইফোঁটা নিতে। বিয়ের পরেও তিনি কখনো শ্বশুর বাড়ী ঘর করতে যাননি। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতেই তাঁর জীবন আরম্ভ হলো, শেষও হলো।

মহর্ষির পুত্রবধূদের মধ্যে সেজদিদি আর ন'দি প্রফুল্লময়ী থাকতেন জোড়াসাঁকোতে। মেজদিদি জ্ঞানদানন্দিনী থাকতেন রঁাচিতে আর কলকাতায় এলে থাকতেন স্টোর রোডের বাড়ীতে। সেজদিদিকে কাছে পাইনি, আমার তখন অল্প বয়েস যখন তিনি মারা যান। ন'দিদি তাঁর সমস্ত আদর ঢেলে দিতেন আমার উপর। তাঁর একমাত্র ছেলে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে তিনি গেরুয়া পরতেন। যেমন ছিলো তাঁর মুখের গড়ন তেমনি ছিলো তাঁর রং। এত বয়েসেও মনে হোতো স্বর্ণচাঁপার পাপড়ির ফিকে সোনা কেউ যেন মাখিয়ে দিয়েছে তাঁর গায়ে। গাইতেও পারতেন চমৎকার। রোজ সকালে যখন পান সাজতে বসতেন তখন আমি গিয়ে জুটতুম। পান সেজেছি অনেক দিন তাঁর কাছে বসে, পান উল্টেপাল্টে ভালোমন্দ পান চিনতে শিখেছি তাঁর কাছে। শুনতুম তাঁর কাছে সেকালের গল্প। প্রায়ই তাঁর শাশুড়ী রবীন্দ্রনাথের মা আর তাঁর বড় জা আমার ঠাকুরমা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্ত্রীর গল্প করতেন। সেকালে ছেলে মেয়েদের রঙ সাফ করতে মা'রা যে কত যত্ন নিতেন তাও শুনেছি তাঁর কাছে। দুধের সরের সঙ্গে কমলালেবুর খোসা শুকিয়ে বেটে, তার সঙ্গে

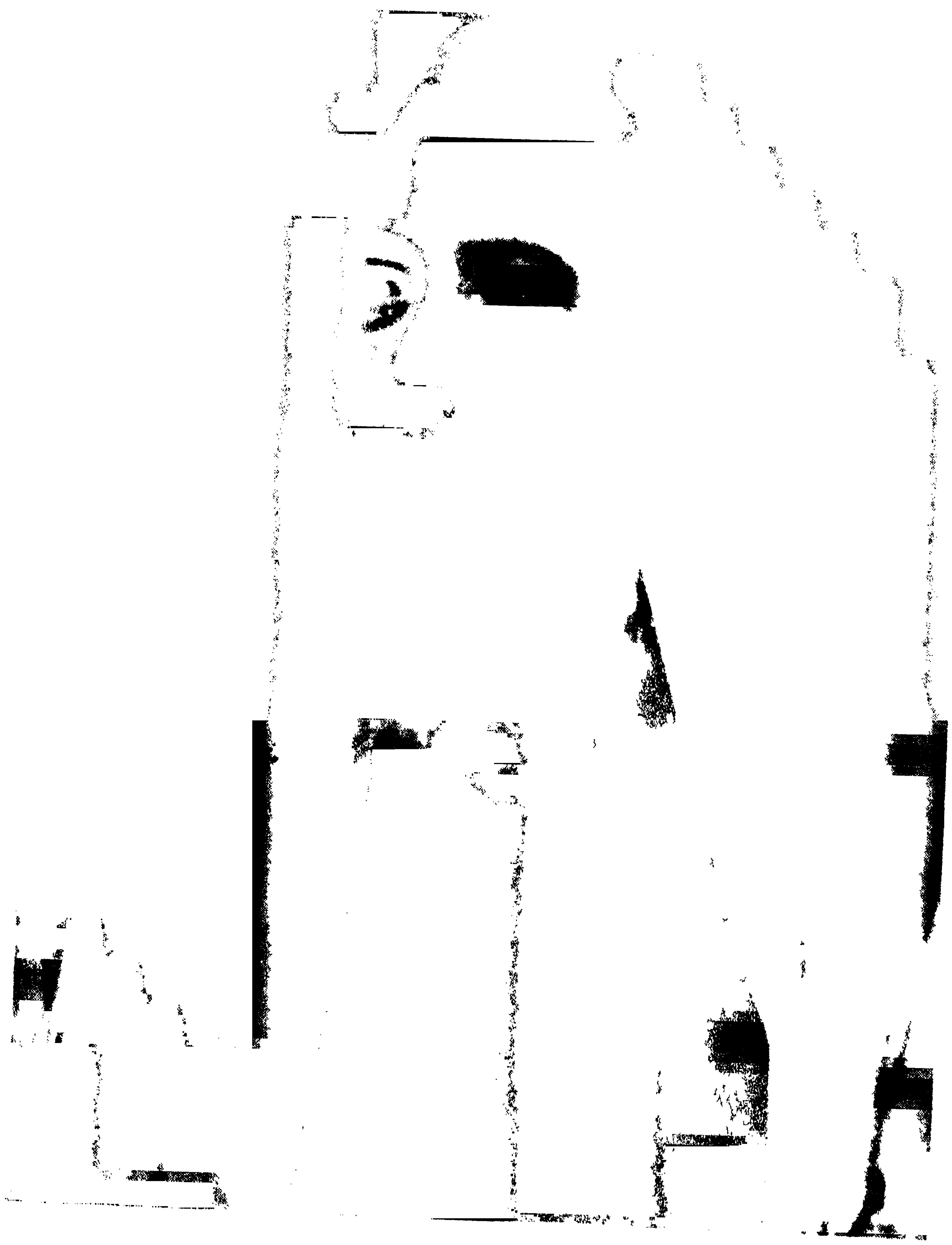

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোলাপের পাঁপড়ি মিশিয়ে যে বস্তুটি তৈরী হোত তার নাম ছিলো রূপটান। এই রূপটান নিয়মিত মাখিয়ে মেয়েরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের লুকোনো রূপ টেনে বের করে আনতেন। প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন যে বাড়ীতে আজকাল একটা ছেলে কিম্বা মেয়ে নেই যার চেহারা কিম্বা রং দেখলে তাঁর শ্বশুর বাড়ীর লোক বলে কেউ মনে করবে। নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর আক্ষেপ মেনে নেওয়া ছাড়া আমার উপায় ছিলো না। তাঁদের সময় বাড়ীতে ছিলেন প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণু। তাঁর কাছ থেকে যে সব গান শুনে শিখেছিলেন তা প্রায়ই গাইতেন। ১৯৪০ সালে আমি যখন জেলে তখন তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষির আমলের শেষ সুরের রেশটুকু মিলিয়ে গেল জোড়াসাঁকোর বাড়ী থেকে।

আট বৎসর বয়সে পিতা আমাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেন। দর্জি পাড়ায় 'ফ্রোবেল ইন্‌স্টিটিউসন্' বলে একটি চমৎকার বিদ্যালয় তখন ছিলো। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন অবিনাশ বসু মহাশয়। বাড়ীতে আমার শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো ম্যাপ, ছবি, নানা রকমের গল্পের বইয়ের মধ্য দিয়ে, এই স্কুলে এসেও সেই একই ধারায় চল্‌লো আমার শিক্ষা। সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে বেহারী দেববর্মন মহাশয়কে। যেমন বিরাট শরীর তেম্‌নি ছিল তাঁর সরস করে পড়াবার শক্তি। সপ্তাহে একদিন তিনি গল্প বলতেন আর আমাদের উপর ভার পড়তো সেই গল্পটা লিখে নিয়ে আসার। দুপুরে আধঘণ্টা টিফিনের ছুটির সময় তিনিও এক একদিন আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন। গ্রীষ্মের ছুটির আগে ইস্কুলে হোতো চড়ুইভাতি। আমার উপর ভার পড়তো বাড়ী থেকে যজ্ঞির থালা আর হাঁড়ি নিয়ে

যাওয়ার। বেহারী বাবু রাঁধতেন আর আমরা সবাই যোগান দিতেম। সেদিন সন্ধ্যেবেলা যখন বাড়ী ফিরতুম তখন তারপর দিন ইস্কুলে যাওয়া হবে না বলে মন কেমন করতো। এ'রকম আর একটি ইস্কুল তখন ছিলো না কলকাতায়। শিশুমন-গুলিকে আখমারা কলে পিষে সব রসটুকু নিংরে নেবার জন্য যে সব ব্যবস্থা তখন সহরময় ছিলো তারই নাম ছিলো ইস্কুল। 'ফ্রোবেল ইন্‌ষ্টিটিউশনে' তিন বৎসর পড়ে যে ইস্কুলে ভর্তি হই সেটা এই জাতেরই অনুষ্ঠান ছিলো। দু একজন শিক্ষক ছাড়া সবাইকে আমরা যমের মত ভয় করতুম। হেডমাষ্টারকে দেখলে যেমন আতঙ্ক হোতো, সুন্দর বন থেকে যদি একটা বেঙ্গল টাইগার এসে হাজির হোতো তো তাকে দেখেও আমাদের এতটা আতঙ্ক হোতো কিনা সন্দেহ। এই 'মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশন' থেকেই আমি ম্যাট্রিক পাশ করি। দুজনের কথা মনে পড়ে, পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয় আর আমাদের হেডপণ্ডিত মহাশয়কে। দীর্ঘকায় সুপুরুষ পূর্ণবাবু পড়াতেন বাংলা, নানা সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক তিনি আমাদের শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও বাংলা লেখবার রীতির প্রতি তাঁর ছিলো সীমাহীন অবজ্ঞা। সমাসবহুল বাঙলার উপর ছিলো তাঁর প্রাণের টান, রচনায় শক্ত শব্দ ব্যবহার করতে পারলে তাঁর খুসির অন্ত থাকতো না। একবার সাহিত্য সম্বন্ধে একটি রচনা লিখতে দিয়েছিলেন তিনি। ব্যাকরণের নিয়ম মানলেই যে সাহিত্য হয় না এই মন্তব্য করেছিলুম আমার রচনায়। এই অপরাধ তিনি সহজে ক্ষমা করতে পারেন নি। আমাদের হেডপণ্ডিতমশায় ছিলেন যেমন তেজী পুরুষ তেমনি স্নিগ্ধ প্রকৃতির মানুষ। তাঁর ভর্ৎসনায় মনে গ্লানির তলানি

জমে থাকত না। তিনি আমাদেব স্নেহ করতেন, আমরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতুম। ইস্কুলের দরজায় বসে বসে ঝিমতো বুড়ো দরোয়ান ভুট্টি। কতবার দুপুরে কয়েক জন বন্ধু মিলে ভুট্টি দরোয়ানকে ধাক্কা মেরে ইস্কুল পালিয়েছি সিনেমা দেখবো বলে। আমার মাথায় ছিলো একমাথা কোঁকড়ান চুল আর তার মধ্যে ভরা ছিলো বিশ্বের দুষ্টুমি। একবার বাড়ী থেকে ইলিশমাছ ভাজা এনে সেকেণ্ড পণ্ডিত মশায়ের পকেটে ফেলে দিয়েছিলুম। নস্যির ডিবেটি পকেট থেকে ওঠাবার সময় হাতে যা উঠে এলো তাই দেখে পণ্ডিত মশায়ের ঢুলুনি থেমে গিয়েছিলো সেদিন।

বাড়ীতে আমি ছিলুম ভোলার জিম্মায়। চান করানো, খাওয়ানো সব সেই করতো। খুব ছোট বয়সে সে এসেছিলো আমাদের বাড়ীতে। আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে সে ইস্কুলেও গিয়েছিলো। সুশ্রী চেহারা, ফিটফাট, সে ইংরেজী পড়তে পারতো, গান গাইতো, সেতারও বাজাতো। বাড়ীর অন্য চাকরেরা তাকে ভোলাবাবু বলে ডাকতো। ভোলাই ছিলো আমার পিতার চাকর, খাজাঞ্চি, পরামর্শদাতা। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই ভোলার হাতে পড়তে হোতো। মুখ ধুয়ে তার সামনে দাঁড়াতুম। সে চুল আঁচরে দিয়ে খাবার খাইয়ে ছুটি দিতো। এক দৌড়ে হাজির হতুম ওবাড়ীর বাগানে ফুটবল খেলতে। সন্ধ্যেবেলা পড়া শেষ হলেই যেতুম আমার ছোট কাকীর ঘরে। তাঁকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তুম। তাঁর সন্তান হয়নি, সমস্ত স্নেহ অজস্র ধারায় বর্ষিত হতো আমার উপরে, বড়ো ভালো বাসতুম তাঁকে। তাঁর মৃত্যুই আমার জীবনে মৃত্যুর দুঃখের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

যাত্রী

তেতলার ছাদ ছিলো আমার আপনার লোক, খেলার সাথী। দুপুর বেলা বাগানে ঘোরা সারা করে আসতুম চলে ছাদে। সিস্থু গাছটার একটা ডাল নুয়ে এসে ছাদটাকে ছুঁই ছুঁই করতো। আমি রোজ হাত বাড়িয়ে সেটাকে ধরতে চেষ্টা করতুম। সামনে দেখা দিতো বহু দূর পর্যন্ত বাড়ীগুলোর চিলের ঘরের মাথাগুলো। মনে হতো নিঝুম দুপুরের রোদে তেপান্তরের মাঠের পক্ষীরাজ-গুলো যেন দলে দলে ঘাড় বেঁকিয়ে ছুটছে। বাগানের দক্ষিণে মদনবাবুর বাড়ীর ছাদে আমারি মত পাক খেতো আমার ছোট বেলার সাথী দেবু আর গোপাল। বাড়ীর উত্তরে গোলাবাড়ীর ধারের সেই লাল বাড়ীর ছাদে আমারই বয়সী দুটি মেয়ে ঘুর-ঘুর করতো। তারাও ঘুড়ি ওড়াতো, আমিও ওড়াতুম। দুষ্টুমি করে ঘুড়ি নামিয়ে আনতুম তাদের হাতের কাছে, যেই ধরতে যেত অমনি সূতো টেনে ঘুড়ি উঠিয়ে নিতুম। ঘুড়ি উড়োবার নেশা ছিলো আমার। ছুটির দিন দুপুর থেকে ঘুড়ি ওড়াতুম। রোদ্দুরে ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ হল খারাপ। একবার ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। বিকেল বেলা ছাদে মা, কাকী, বোনেরা সব বেড়াতেন। রবীন্দ্র-নাথও বেড়াতেন এক একদিন সন্ধ্যের সময়। সন্ধ্যের আলো সিস্থু গাছটার পাতার মধ্যে ঝল্‌মল্‌ করতো, গলির মোড়ে শিবের মন্দিরে বাজতো আরতির ঘণ্টা, চিলের কোঠাগুলো আবছা হয়ে আসতো অন্ধকারে, আমার পক্ষীরাজ ঘোড়াগুলো তাদের কালো কেশর ফুলিয়ে থামতো এসে বাড়ীর ছাদে ছাদে।

মহর্ষির মৃত্যুর কিছুদিন পরে দাদামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যাঠামশায় দ্বিপেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর পাট গুটিয়ে শান্তিনিকেতনে

চলে গেলেন। বৈঠকখানা ঘরে তখন থাকতেন আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথ। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে প্রায় কুড়ি বছরের বড়। বৌঠাকরুণের মুখে শুনেছি যে তাঁর বাসি বিয়ের দিন দশ মাসের শিশু আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে দেওয়া হয়। আমরা সব ভাইবোনেরা যেমন ভালবাসতুম দাদা দিনেন্দ্রনাথকে, তিনিও আমাদের তেমনি স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আমাদের আব্দারের অন্ত ছিলো না। ছোটদের সঙ্গে যেমন তাদের সমবয়সী হয়ে তিনি মিশতে পারতেন, বড়দের আসরেও তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো। অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর মনের রসবোধের সূক্ষ্ম শিকড়গুলি দেশবিদেশের সাহিত্যের মধ্যে নিয়তই রসদ সংগ্রহ করতো। রসের ওজন বোধ ছিলো তাঁর তীক্ষ্ণ। যেমন অপূর্ব আবৃত্তি করতে পারতেন তেমনি কর্‌তে পারতেন অভিনয়। গলায় ছিল তাঁর যাদু। তাঁর কণ্ঠ থেকে যে সুর ঝরে পড়তো ঝরণার মতো, তার গতি যেমন ছিলো অনায়াস, তেমনি ছিলো তার গাম্ভীর্য ও মধুরতা। এমন দরদভরা প্রাণ-উধাও-করা কণ্ঠস্বর কমই শুনেছি আমার জীবনে। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেই শিখিয়ে দিতেন দিনেন্দ্রনাথকে। আর আমরা শিখতুম দাদা দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বৈঠকখানা ঘরের সে মজলিস একদিন ভেঙ্গে গেল। শেষবার শান্তিনিকেতন থেকে চলে এসে জোড়াসাঁকোয় থাকবার কিছুকাল বাদেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকেই বাড়ীতে পাবলিক থিয়েটার কিম্বা বাইজীর নাচ নিষিদ্ধ ছিলো। রসসৃষ্টির অবাধ সুযোগ ছিলো বাড়ীতে কিন্তু রসের নামে সেকালের ধনীদের জীবনের প্রচলিত

কলুষ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারে নি। গান, নৃত্য, অভিনয় যা কিছু হোতো বাড়ীতে, তার স্রষ্টা ছিলেন বাড়ীরই মেয়েপুরুষেরা। বাড়ীতে প্রথম অভিনয় যা আমার মনে আছে সে হচ্ছে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। আমার বয়স তখন ছ' বছর হবে। আমরা ভাইবোনেরা তাতে অভিনয় কোরে ছিলুম। নিজের মনে আমরা অভিনয় করতুম ছোটদের দল। কখনো দোতলার সিঁড়িটা আমাদের ষ্টেজ হতো, কখনো বা ঘরের তক্তপোষের উপর মশারি খাটিয়ে ষ্টেজ তৈরী হতো আমাদের। বড়োদেরও ডেকে নিয়ে দেখাতুম আমরা। বাঁকুড়ার ছুর্ভিক্ষের সাহায্যে যখন 'ফাল্গুনী' অভিনয় হয় আমাদের উঠোনে আমার বয়স তখন দশ এগার বছর হবে। কবিশেখরের ভূমিকার রবীন্দ্রনাথের সাজ আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। ঠিক মনে হলো যেন প্রাচীন ভারতের স্বপ্নলোক থেকে এক কবি এসে দাঁড়ালেন, রেবার তীরে মহাকালের মন্দিরে আরতির সময় শঙ্কর যেখানে নৃত্য করেন সেই উজ্জয়িনীর কবি। রবীন্দ্রনাথ বাউলের ভূমিকাও গ্রহণ করেন। মনে গেঁথে আছে আজও রাজার ভূমিকায় গগনেন্দ্রনাথের অভিনয়, শ্রুতি-ভূষণ বেশে অবনীন্দ্রনাথ, জগদানন্দ রায় মহাশয়ের অপূর্ব অভিনয় দাদার ভূমিকায় আর শিশু সমরেশের গান। প্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য। শুধু দাঁড়িয়ে দেখবার জন্যে ছু'শো টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলো কেউ কেউ। আমি ও আমার এক ভাই নবেন্দ্র প্রোগ্রামই বিক্রী করেছিলুম কয়েক শ টাকার। ষ্টেজ সাজালেন অবনীন্দ্রনাথ আর নন্দলাল। সকালে ছুপুরে কতবার অবনীন্দ্রনাথ এসে বসছেন উঠোনে আর ষ্টেজের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। মাঝে মাঝে 'নন্দলাল' বলে দিচ্ছেন হাঁক, নন্দবাবু এসে দাঁড়াচ্ছেন ত্রস্ত হয়ে।

এটা ওটা করবার জন্যে তাড়া দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে এসে বসতেন। তের চোদ্দ হাজার টাকা উঠেছিলো দুদিনের অভিনয়ে। পরের দিন সকালবেলা আমরা ছোটদের দল করলুম ফাল্গুনীর অভিনয়, বড়োরা হলেন দর্শক। আমাদের সেই দক্ষিণের হল ঘরে আর বিচিত্রার ঘরে এমনি করে আমরা বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা 'গোড়ায় গলদ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'বশীকরণ', 'শকুন্তলা' অভিনয় করেছিলুম। প্রত্যেকটাতে আমার কিছু না কিছু অংশ ছিলো। বিদেশী ও স্বদেশী সাহিত্যের বই অফুরন্ত ছিলো বাড়ীতে, পড়বার নেশাও ছিলো সর্বনেশে। ডানুন্‌সিৎও, মেটারলিঙ্ক, অস্কার ওয়াইল্‌ড, ডিকেন্স, মোপাসাঁ, বাল্‌জাক্, সবাইকে সেদিন টেনে নিয়েছি আমার মনের মধ্যে। বয়েস তখন পনের ষোলর বেশী নয়, মন তখন অগস্ত মুনির মত এক গণ্ডুষে রস-সমুদ্র পান করবার জন্য ব্যাকুল। রস-বিচারের দিন তখনও ঠিক আসেনি। সন্ধ্যেবেলা কাকা রথীন্দ্রনাথ আমাদের ইয়োরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা পড়ে শোনাতেন। এমনি করে নিজের অজানিতে মনের মধুকোষে সঞ্চিত হতে লাগলো রস, রুচির পর্দা বাঁধা হতে লাগলো এমন এক সুরে যা আজ পাত পেড়ে আঙ্গুল চেটে মোটা রস পান করবার প্রগতি-সাহিত্যের যুগেও নামিয়ে আনতে পারে নি।

শরীরের বনেদ আমার ছিলো মজবুৎ। দিশি ও বিদেশী কোনো কসরৎই আমি বাদ দিই নি। কুস্তির সখও কিছু কাল মিটিয়ে নিয়েছিলুম। বেলা পর্যন্ত ঘুমনোর অভ্যেস আমার কোনোদিন ছিলো না। অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভাঙ্গতো, বাগানে কোন্ ভোর থেকে কোকিল হয়রাণ হোতো ডেকে ডেকে, ঝির্

যাত্রী

ঝির্ করে আসতো দখিনে বাতাস, আমি উঠে যেতুম ছাদে বেড়াতে। দেখতুম রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূবের উপাসনার ঘরে পাথরের চৌকির উপর বসে আছেন চোখ বন্ধ করে পূবের দিকে মুখ কোরে। পূবের জান্লা দিয়ে ভোরের সূর্যের প্রথম আলো পড়তো এসে তাঁর মুখের উপর। উপাসনা শেষ করে তিনি উঠে যেতেন।

বাঁশী বাজাবার খেয়াল এই সময় আমাকে পেয়ে বসে। আমার মেজদিদি এঁণার সঙ্গে রেষারেষির ফলেই সুরু হয় আমার বাঁশী বাজানো। বাড়ীতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তো, আমি যেতুম ছাদে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁশী বাজাতুম। কতো বাঁশী, কতো রকমের বাঁশী যে এই সময়ে যোগাড় করেছিলুম তার অন্ত নাই। এই সময় কলেজে ঢুকলুম ইস্কুলের পাঠ শেষ করে। প্রেসিডেন্সি কলেজের পশ্চিমে ছিলো একটা মাঠ, দুপুর বেলা সেখানে গাছের তলায় বসে বাঁশী বাজাতুম। রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছি পুরীর সমুদ্রের ধারেও বাঁশী বাজিয়ে। একটা বাঁশের চোঙা করেছিলুম আমার বাঁশী রাখবার তূণ, সেইটি পিঠে বেঁধে বার হতুম আমার ভ্রমণে। একবার মনে আছে গেছি কেন্দুলীর মেলায়। হাজার হাজার বাউল এসেছে। তাদেরি সঙ্গে গাছের তলায় পেতেছি আমার আড্ডা, গান গেয়েছি, বাঁশী বাজিয়েছি, অজয়ের তীর থেকে তুলে এনেছি হাঁসের পালকের মত শাদা কাশ।

আমি লোকটা জাতে রোম্যান্টিক। আমার জীবনটা হচ্ছে কল্পনার স্বপ্নে ভরা অক্ষয়-তূণ। মনে স্বপ্নের শেষ নেই, স্বপ্নের কাজল চোখে মেখে আমি এ পৃথিবীতে এসেছি। আর নিয়ে

যাত্রী

এসেছি মনের মধ্যে অনন্ত বিরহ। যা দেখেছি দু'চোখ ভরে, তাতে মন ভরেনি। দেখেছি আলো, তবু আরো আলো, আকাশ-উজাড়-করা, প্রাণ-ডোবানো, সব-কালোকে-দেউলে-করে-দেওয়া আলোর জন্যে মন আমার তৃষিত হয়েছে। সবুজের ঢেউ দুলে দুলে উঠ্‌ছে মাঠে মাঠে তবু মেটেনি মনের সবুজের তৃষা। পরমাশ্চর্য, অনুপম যে কল্পনা মন করেছে, যে স্বপ্ন মন দেখেছে তার তুলনায় সব সবুজ ফিকে হয়ে গেছে। এই জন্যে দু'চোখ ভরে যে রূপ দেখেছি, কানে যে সুর শুনেছি, তাদের ম্লান করে দিয়েছে সেই সব অফুরন্ত রূপ-ছবি যা সৃষ্টি করেছে মন কল্পনায়। সেই সব কানে-শোনা সুরকে ছাপিয়ে গেছে সুরের পরে সুর, যে অফুরন্ত সুর শুনেছে মন কল্পনার স্বপ্ন-লোকে। যা কিছু মন দেখেছে আর শুনেছে, কেবলই মনে হয়েছে কোথায় যেন কিছু কম থেকে গেছে, কোথায় যেন রঙটা একটু ফিকে থেকে গেলো, সুর কেমন যেন ঠিক পর্দায় এসে থামলো না, কিছু মীড় বাদ থেকে গেলো। বাস্তবের সব রূপ-রসের মধ্যে এই অপূর্ণতার আভাস বারে বারে পায় বলেই মন সৃষ্টি করে কল্পনার স্বপ্ন-লোক। সেখানে বাস্তবের রূপের ও রসের সমস্ত অপূর্ণতা, সমস্ত দৈন্য মিলিয়ে যায়, কল্পনা তার হাতুড়ি দিয়ে বাস্তবকে ভেঙ্গে চুরে, তার সঙ্গে স্বপ্নের মাল-মশলা মিশিয়ে এমন আশ্চর্য রূপ ও রসের সৃষ্টি করে যাতে মন ভরপুর হয়ে ওঠে আনন্দে। বাস্তবের অপূর্ণতার এই বোধ মনের মধ্যে সমস্ত অনুভূতির শিরাগুলোকে ব্যথায় টন্‌টনে করে রাখে। কল্পনা যখন তার রূপরসে নিটোল খেলনাগুলো সৃষ্টি করে নিয়ে হাজির করে মনের সামনে তখন সেই আগেকার

ব্যথার সঙ্গে মিশে যায় এক নূতন ব্যথা, পূর্ণতাকে পাওয়ার ব্যাকুল বেদনা। জীবনের কেন্দ্রের অসীম অনন্ত বিরহ বলি আমি একেই। এই বিরহের তৃষায় মনের অধর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, মনের কপোল চির-পাণ্ডুর। বাস্তবের অপূর্ণতা-বোধ আর মনের মধ্যে পূর্ণ রূপসৃষ্টি এ হলো রোম্যান্‌টিকের জীবন-লীলা, আর এই হোলো আমার ভিতরটার আসল চেহারা। আমি জাতে রোম্যান্‌টিক। হালের মনোবিজ্ঞানের বুলি-আওড়ানেওয়ালা 'আধুনিক' আমার উপর অবজ্ঞায় ও করুণায় যে মাটির উপর নুয়ে পড়বে তা' আমি বেশ বুঝতে পারছি। ঠোঁটে, মুখে, চোখে অবজ্ঞার বিদ্যুৎ খেলিয়ে বিজ্ঞ 'আধুনিক' বল্‌বে, এ রোম্যান্‌টিসিজম্‌ তো বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়ার (এস্‌কেপিজম্‌) খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাপুরুষতারই আর এক নাম রোম্যান্‌টিসিজম্‌! ঝুটো আধুনিককে আমি বলবো, নকলনবীশ আধুনিক, তুমি জীবন সম্বন্ধে আদবেই ওয়াকিবহাল নও। রোম্যানটিসিজম্‌ বাস্তবকে এড়িয়ে-যাওয়া ভীরুতা নয়। বাস্তব জীবনের দৈন্য, অপূর্ণতা যে মন গভীরভাবে অনুভব করেনা সে মন রোম্যানটিক্‌ হতেই পারে না। এই অপূর্ণতা-বোধ মনের মধ্যে অসহ্য দহন-জ্বালা সৃষ্টি করে। তবেই মনে বিদ্রোহের কালবৈশাখী ঘনিয়ে আসে, বিদ্রোহী মন পূর্ণতার সন্ধানে বের হয়, কল্পনার সমস্ত শক্তি দিয়ে পূর্ণতার রূপসৃষ্টির কাজে লেগে পড়ে। পূর্ণতার কল্পনা কি যে-সে মনের কাজ! কত বীর্য, কতো সংযম এই কল্পনার প্রাণ-রস জোগায় তার খবর কি ঝুটো 'আধুনিক' রাখে? পূর্ণতার কল্পনা ও পূর্ণতার রূপসৃষ্টি যে মানুষ করে সে নোংরা বাস্তবকে প্রচণ্ড আঘাত করে, সে জুগিয়ে দেয়

কোটি কোটি লোকের হাতে এই বাস্তবকে ভেঙেচুরে নতুন বাস্তব সৃষ্টি করবার হাতিয়ার। যার বুক বাস্তবের এই দীনতার ব্যথায় ভরে উঠেছে, যার মনে এই অ-ধরা পূর্ণতার ছবি ক্ষণিকের জন্যেও কল্পনার আলোকে ফুটে উঠেছে সে কি আর বসে থাকতে পারে নিশ্চেষ্ট হোয়ে আত্মরতির রসে মজে! সে রোম্যান্টিক তখন পথে বের হয়ে পড়ে, মিথ্যের চোর-কাঁটা মাড়িয়ে, নিন্দার শিলা-বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাকে পথ চলতে হয়। মানুষের ইতিহাস যখনই এসে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে যুগের চৌমাথায় তখন এই রোম্যান্টিকেরাই নিজেদের জ্বালিয়ে ধরেছে মশাল করে, নিজেদের পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে মানুষকে পথ দেখাতে। প্রত্যেকটি সৃজনশীল মানুষই তাই রোম্যান্টিক, প্রত্যেকটি সৃজনধর্মী যুগও এই কারণেই রোম্যান্টিক। তাই 'প্রমিথিয়ুস আন্‌বাউণ্ড' ও 'রিভোল্ট্ অফ্ ইস্‌লাম' এর কবি শেলী রোম্যান্টিক। আর তাঁর যুগ, ইংলণ্ডের একটি সৃষ্টি-ধন্য বিরাট যুগ রোম্যান্টিক যুগ। ঠিক এই কারণেই, 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষ'ার কবি, 'বন্দরে বন্ধন-কাল এবারের মতো হোলো শেষ' এই খবর যিনি আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন সেই চলার কবি, ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে বাছা বাছা ভূতগুলোকে বের করে আনবার কবি রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক। বাস্তবের দীনতা, অপূর্ণতা, ক্রূরতা, নোংরামি অসহ্য, পূর্ণতার ছবি মন দেখেছে। এই দীনতা, ক্রূরতা দূর করে সেই পূর্ণতা আনতেই হবে জীবনে, বের হয়ে পড়ো পথে। এই হোলো রোম্যান্টিকের ডাক। এই ডাকে আমার প্রাণ সাড়া দিয়েছে। এই ডাকেই আমার প্রাণ তার পূর্ণ রস পেয়েছে। এই জন্যেই আমি রোম্যান্টিক,

আর রোম্যান্টিক বলেই আমি বিপ্লবী। রোম্যান্টিক বলেই আমি বিপ্লবী এই কথাটা আধুনিকদের কানে তো বেসুরো বাজবেই, তাদের বাদ দিয়েও আরো অনেকের কানে বেসুরো ঠেকবে। তবু এ কথাটা আমায় জোর গলায় বলতে হবে, জীবনের সদর রাস্তায় একরাশ ধুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাঙা পাঁজরের স্তূপ নিজের এই জীবনের দিকে মাথা তুলে অবিকম্পিত কণ্ঠে বলতে হবে; জাতে আমি রোম্যান্টিক, তাই আমি বিপ্লবী।

কতোটুকু পেয়েছি ? নিজেকেই শুধোই—কতোটুকু পেয়েছি ? সারা দুনিয়ার পথ, এবড়োখেবড়ো পথ, চড়াইয়ের পথ, কণ্টকাকীর্ণ পথ চলার পর কতোটুকু পেয়েছি ? কতোটুকু এগিয়েছি আদর্শের দিকে ? বার বার তো দেখেছি যেখান থেকে একদিন চলা সুরু করেছিলুম সেখানে আবার ফিরে গেছি। আবার চলা সুরু করেছি হার-না-মানা আমার এই পাগল মনটাকে নিয়ে। যেটুকু পেয়েছি তারি জোরে কি চলেছি, না যা-সব পাইনি, যার রঙে গন্ধে বুক ভরে আছে তারি পাগল-করা টানে চলেছি ! সেই না-পাওয়াটার পাওয়া কি একেবারে নিশ্চিত ? এড়িয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনাই কি তার নেই ? প্রত্যেকটি আদর্শের বেলায়ই কি বলা যেতে পারে না যে পাওয়া, না-পাওয়ার দুই সম্ভাবনার ঢেউয়ের চূড়োয় দুল্‌ছে সেই আদর্শ ? তবুও যে মানুষ চলে, সে কেন চলে ? সে রোম্যান্টিক তাই সে না-পাওয়ার টানে চলে। সে রোম্যান্টিক অর্থাৎ পাওয়ার দম-আটকানো বাঁধনের মায়া-মুক্ত সে, না-পাওয়ার আকাশে ডানা মেলেছে তার প্রাণ, তাই যা হয়তো কখনো পাবে না সেই

পরিপূর্ণতার স্বপ্নের টানে সে চলে। মানুষ যখন কস্তুরী মৃগসম পাগল হয়ে বনে বনে ফেরে তখন সে কোন 'আপন-গন্ধে' পাগল হয়ে ফেরে? এই আপন-গন্ধ হচ্ছে প্রাণের মধ্যে পরিপূর্ণতার চকিত আভাসের আমেজ, পরিপূর্ণতার ক্ষণিক প্রকাশের দ্বারা মনে যে রসের জোয়ার বয়েছে তার গন্ধ।

এরই জোরে মানুষ পথ চলে, নইলে পথ-চলা সম্ভব হোতো না। মানুষের ভবিষ্যৎ, সেই নির্মল, জ্ঞান-উদ্ভাসিত, অনুরাগ-রঞ্জিত ভবিষ্যৎ যার কথা বিপ্লবী বলে থাকে তার সবটাই সমাজ-বিজ্ঞানের আর অর্থনীতির নিয়ম থেকে ছেঁকে তোলা সম্ভব নয়, মিশোনো আছে তার সঙ্গে স্বপ্নের অনেক মালমশলা। বিপ্লবী মাত্রেই তাই রোম্যান্টিক, আর প্রত্যেক খাঁটি রোম্যান্টিকের মধ্যে তাই প্রচ্ছন্ন রয়েছে বিপ্লবী।

আমার প্রাণের এই রোম্যান্টিক রস আমাকে একরোখা, জেদী আর আপোষ-অসহিষ্ণু করে গড়ে তুলেছে। বাস্তবের সঙ্গে আপোষ করতে আমি রাজী হইনি সারা জীবনে। আদর্শের অন্ধকার পথে মন যাত্রা সুরু করেছে একদিন, সে অভিসার কি কখনো সম্ভব আপোষের বাঁধা সড়কের পথে?

তখন কিশোর বয়েস। উজাড় করে পড়ে চলেছি দেশী-বিদেশী সাহিত্য, গান গাইছি, বাঁশী বাজাচ্ছি। মন স্বপ্নে মশগুল। মনে পড়ে এই বয়েসে একটি স্বপ্ন প্রায়ই দেখতুম। দেখতুম একটি মাঠ, দিগন্ত-ছোঁওয়া প্রকাণ্ড মাঠ, সেই মাঠের উপর দিয়ে আমি প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে চলেছি, আমার পা কিন্তু মাটি ছুঁচ্ছে না। এই অদ্ভুত স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখতুম। ইয়োরোপে থাকাকালীন একজন সাইকোঅ্যানালিষ্ট মনোবিজ্ঞান-

দক্ষকে এই স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলুম। তিনি বলেছিলেন— বাস্তবকে অস্বীকার করছে তোমার মন, তাই মাটিকে স্পর্শ করছেনা, উড়ছে মন কল্পনার আকাশে। স্বপ্নের অর্থ হোলো এই। অনেক দিন পরে নিজের জীবনের আসল কাঠামোটি কি সেটা নিয়ে মনের মধ্যে হাত্ড়াতে হাত্ড়াতে নিজের আসল চেহারাটা যখন দেখতে পেলুম তখন বুঝতে পারলুম যে স্বপ্নটা আমার রোম্যান্টিক প্রাণেরই ব্যঞ্জনা।

উনিশশো সতেরো সাল। স্কুলের পাঠ শেষ করে তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকেছি। স্কুলের কড়া বাঁধন থেকে ছুটি পেয়ে মনটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কলেজের কমন্রুমে গানের ফোয়ারা বইয়ে দিলুম কপিল দেব আমি আর হরেন দত্ত। হরেন সুকণ্ঠ, সুগায়ক বলে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। অল্প বয়সেই তার মৃত্যু হয়। ক্লাসেও গুঞ্জন চল্তো পেছনের বেঞ্চিতে বসে। 'একদা তুমি প্রিয়ে,' 'পথিক হে ঐ যে চলে সঙ্গী তোমার দলে দলে,' 'সে কোন্ বনের হরিণ,' এই সব গান তখন সদ্য সদ্য তৈরী হয়েছে। 'বিচিত্রা'র যুগ তখন সুরু হয়েছে। বাড়ীতে গান শেখা হোলেই কলেজে কমন্রুমের আসরে সে সব গান গাইতুম। কলেজের পশ্চিমে যে প্রকাণ্ড মাঠ ছিলো, সেখানে গাছের তলায় বসে আমি আর কপিল গানের পর গান গেয়ে চলতুম দুপুরের পর দুপুর। বাঁশীও নিয়ে যেতুম সঙ্গে করে, আমাদের গাছের তলার আসর বাঁশীর দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হতোনা। কলেজের বইয়েতে মন আদবেই বসতো না, তাছাড়া যাঁরা পড়াতেন তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন সমস্ত রস নিঙরিয়ে নিয়ে সাহিত্যকে একেবারে রসহীন করে তুল্তে। তারপর সেই

ছিব্‌ড়ে পরিবেশন করতেন তাঁরা ছাত্রদের কাছে। ব্যাকরণ আর ঐতিহাসিক তত্ত্বের ফাঁস পড়িয়ে সাহিত্যরসের প্রাণ-হত্যার একটানা রসমেধ যজ্ঞ ছিলো আমাদের ক্লাশগুলো। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো, ক্লাশ পালিয়ে টেনিস খেলতুম কিম্বা পশ্চিমের মাঠে গাছের তলায় জমাতুম গানের আর বাঁশীর আসর।

উনিশশো সতের সাল, তখন সবে মাত্র কলেজে ঢুকেছি এমন সময় রবীন্দ্রনাথ এলেন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় 'ডাকঘর' নাটিকার অভিনয়ের আয়োজন করতে। সেই সময়ই কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় আর এ্যানি বেসণ্ট কংগ্রেসের সভানেত্রী হন। মনে আছে তাঁকে সভানেত্রী করা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র মতদ্বৈধতার উদ্ভব আর তার ফলে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের কাছে রাজনৈতিক নেতাদের ঘন ঘন আসা যাওয়া। যতদূর মনে পড়ে একদিকে ছিলেন সুরেন বাড়ুয্যে আর অন্যদিকে বৈকুণ্ঠ সেন। বৈকুণ্ঠ সেনের দল রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক করেন। পরে দু'দলের আপোষ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সেই কংগ্রেসের অধিবেশনেই আমরা 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি গাই। এই অধিবেশনের সময়েই রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করেন। বাড়ীতে আমি, আমার দিদি রমা, আর দাদা দিনেন্দ্রনাথ প্রথমে গানটি শিখি ও প্রকাশ্য জনসভায় সর্বপ্রথম সেবারে কংগ্রেসের অধিবেশনেই এই গানটি গাওয়া হয়।

'বিচিত্রা'র আসর তখন সবে সুরু হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, কবি সত্যেন দত্ত, সুকুমার রায়, ঔপন্যাসিক

যাত্রী

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়, মনিলাল গঙ্গোপধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, যতীন বাগচী প্রভৃতি কলাবিদ, কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক ও সমালোচকদের নিয়ে 'বিচিত্রা'র সৃষ্টি করেন রবীন্দ্রনাথ। রসবিদ রসস্রষ্টাদের আসর তখন একটিও ছিলোনা। কলকাতার মতো এতোবড় সহরে এমন একটি জায়গা ছিলোনা যেখানে মনের অন্দরমহল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রসিকদের সমাবেশ হতে পারতো কিংবা যেখান থেকে খাঁটি সাহিত্য-রসের পরিবেশন করা যেতে পারতো রসপিপাসুদের। 'বিচিত্রা'র আসর সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ সেই দৈন্য ঘোচালেন। কতো গান যে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তৈরী করলেন তার শেষ নেই। দাদা দিনেন্দ্রনাথ, দিদি রমা আর আমি কতো গান যে গেয়েছি 'বিচিত্রা'র আসরে তার অন্ত নেই। দিদি রমার গলায় 'এই যে কালো মাটির বাসা,' 'নাগো এই যে ধূলা আমার নাএ,' 'সাঁঝের রঙে রঙিয়ে গেলো হৃদয়গগন,' 'সন্ধ্যা হোলো মা বুকে ধরো' এই গানগুলো যারা শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছে তারা কখনো ভুলবে না। রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে তাঁর গানগুলো আমার দিদি রমার গলায় যেমন রূপ নেয় এমন খুব কম লোকের গলাতেই নেয়। মনে পড়ে একটি দুপুরের কথা। ঘুরঘুর্ করতে করতে আমি 'বিচিত্রার ঘরে গিয়ে হাজির। দেখি রবীন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজাচ্ছেন আর গুন্‌গুন্ করে গাইছেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলুম। 'আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী' এই কবিতাটির কিছু অংশ নিয়ে সুর দিয়ে গান রচনা করছিলেন তিনি। 'বিচিত্রা'র আসরে সত্যেন দত্ত পড়লেন তাঁর কবিতা, প্রমথ চৌধুরী করলেন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা

আর রবীন্দ্রনাথ শোনালেন তাঁর 'পলাতকা'র কবিতাগুলো আরো কত শত কবিতা আর গল্প। 'বিচিত্রা'র আসরে যোগদান করবার সুযোগ লাভের জন্য কলকাতার সাহিত্য-রসিকেরা তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে রসের পর্দা-বাঁধা 'বিচিত্রা' কলকাতার রসিক সমাজে রসের রুচি সৃষ্টি করতে যে কি অসামান্য কাজ করেছে তা বলে শেষ করা যায়না। ফরাসী দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে 'সাঁল'র যে দান কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে 'বিচিত্রা'র দাম তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। 'বিচিত্রা'র মতো একটি মজলিস যদি আজ থাকতো তা'হলে রুচির এমন জঘন্য বিকার ঘটতো কি? তা'হলে রস পরিবেশনের অছিলায় পাঁকের সওদা ফিরি কোরে ফিরতে পারতো কি 'আধুনিক' সাহিত্যিকেরা! সমাজের মার্জিত রুচি অতি সহজেই তাদের প্রত্যাখ্যান করতো।

'ডাকঘর' অভিনয়ের কথা বলছিলুম। 'বিচিত্রা'র ঘরে রিহার্সালের পালা সুরু হোলো। 'অমল' সাজলো শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র বালক আশামুকুল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার অংশ গ্রহণ করলেন। গগনেন্দ্রনাথ সাজলেন অমলের পিসেমশায়, অবনীন্দ্রনাথ মোড়ল আর বৈদ্য, রথীন্দ্রনাথ রাজবৈদ্য, দাদা অসিতকুমার দইওয়ালা আর অবনীন্দ্রনাথের ছোটো মেয়ে সুরূপা সাজলো সুধা। ভিতর থেকে গাওয়া গেলো 'হ্যাদে গো নন্দরানী,' গাইলেন দিদি রমা আর আমার জ্যাঠতুতো বোন হাসি আর বাঁশী বাজালুম আমি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকায় নেচে নেচে গাইলেন 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' আর আমি বাজালুম বাঁশি তাঁর গানের সঙ্গে। 'বিচিত্রা'র ঘরের পশ্চিম দিকে স্টেজ

বাঁধা হলো দড়মা দিয়ে, তার উপরে আঁকা হোলো আল্‌পনা। ঘরের কোনে রাখা হোলো পিলসুজ আর খড়ের চালের উপরে বাবুই পাখীর শূন্য বাসা। সাতদিন ধরে অভিনয় হয়। একদিন কংগ্রেসের সব নেতারা অভিনয় দেখতে আসেন। সেদিন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গান্ধীজি, লোকমান্য তিলক, মালবীয়জী, এ্যানি বেসণ্ট আরো অনেক নেতা।

আমাদের বাড়ীতে আমি অনেক অভিনয় দেখেছি, ইয়োরোপে থাকা-কালীনও প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের অভিনয় আমি দেখেছি ও মুগ্ধ হয়েছি। সে সব অসাধারণ অভিনয়ের কথা স্মরণ রেখেও আমি বলছি যে 'ডাকঘরে'র যে অভিনয় আমি দেখেছি তার মতো আশ্চর্য অভিনয়, সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত অভিনয় আমি মাত্র আর একবার দেখেছি জীবনে, আর সেটা হচ্ছে মস্কোর ভাগ্‌তান্‌গভ্‌ থিয়েটারে 'প্রিন্সেস্ তুরেনদতে'র অভিনয়। 'ডাকঘর' নাটিকায় অবনীন্দ্রনাথের 'বৈদ্য' আর 'মোড়ল' এই দুই চরিত্রের অভিনয় সে যে কি অপূর্ব, আশ্চর্য সৃষ্টি তা' যে না দেখেছে তার পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। আমার মতে অভিনেতা হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বড়ো। যে অংশই গ্রহণ করুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থেকে যেতেন, রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত সচেতন সত্তা বিলীন হোতে পারতোনা যে চরিত্র অভিনয় করতেন তার মধ্যে। অবনীন্দ্রনাথ আশ্চর্য ভাবে সে চরিত্র বনে যেতে পারেন। 'ডাকঘরে' অবনীন্দ্রনাথের অভিনয় রবীন্দ্রনাথের অভিনয়কে ছাপিয়ে চলে গিয়েছিলো। তার আর একটি প্রমাণ এই যে অন্য সকলের অভিনয়ের স্মৃতি কিছু না কিছু ম্লান হয়েছে কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের

অভিনয়ের স্মৃতি জ্বলজ্বলে হয়ে রয়েছে মনের মধ্যে, তার রঙ্ এতোটুকুও ফিকে হ'য়ে যায়নি।

সুরের বিনি সুতোয় গাঁথা 'বিচিত্রা'র সেই সন্ধ্যেগুলি আজও হারিয়ে যায়নি। পথের ধূলোয় বাসা বেঁধেছি, ধূলোর মদ পান করে মাতাল হ'য়ে বীভৎস চীৎকার করে চলেছি দিনের পর দিন, তবু স্মৃতির উজান বেয়ে মন বারবার ফিরে যায় যে কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্তে, 'বিচিত্রা'র সন্ধ্যেগুলি তাদের অন্যতম!

এর কিছুদিন পরে দাদামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথ এলেন শান্তি-নিকেতন থেকে। তার কিছুকাল আগে তাঁর নিউমোনিয়া হয়েছিলো, জোড়াসাঁকোয় যখন এলেন তখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ওঠেননি। বৈঠকখানা ঘরে তিনি থাকতেন, সকাল-বিকেল কাটাতেন দক্ষিণের বারান্দায়। প্রতিদিন দুপুর বেলা ডিকেন্সের নভেল কিংবা আরব্যোপন্যাস পড়ে শোনাবার জন্যে আমার তলব পড়তো। এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব দ্বিজেন্দ্রনাথকে ভুলিয়ে ওষুধ খাওয়াবার জন্যে গান গেয়ে শোনাতেন। কলকাতার লর্ড বিশপ্, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হীরেন দত্ত এঁরা প্রায়ই আসতেন। দক্ষিণের বারান্দায় দ্বিজেন্দ্রনাথের আসর জমে উঠতো, তাঁর আকাশ-ছোঁওয়া হাসির শব্দে বাড়ী গমগম্ করতো। পাঁচনম্বরের বাড়ী থেকে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্র-নাথ, অবনীন্দ্রনাথ সেই হাসির টানে এসে জুটতেন। দক্ষিণের বারান্দা ঝল্‌মল্ করতো তাঁর হাসির আলোতে। রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাছে এসে বসতেন সেখানে। সবে তখন নিউমোনিয়া থেকে উঠেছেন তবুও সকালে ঠাণ্ডা জলে স্নান একদিনের জন্যেও

বন্ধ দেননি। আমাদের শত কাকুতি মিনতিতেও সে অভ্যেস কয়েক দিনের জন্যেও বন্ধ করাতে পারিনি। দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছিলেন একদিন সন্ধ্যে বেলা, হঠাৎ ঝড় উঠলো, কিছুতেই ঘরে যাবেন না। দাদা দিনেন্দ্রনাথ আর আমি বারান্দার থাম-গুলোর মধ্যের ফাঁকগুলো বন্ধ করে দেবার জন্যে কয়েকটা কম্বল নিয়ে বাঁধতে সুরু করলুম। অন্ধকারের মধ্যে থেকে তিনি কিন্তু আমাদের কম্বল বাঁধবার চেষ্টা দেখতে পেয়েছেন। তারপর সে কী চীৎকার! কম্বল নিয়ে দৌড় আমরা দুজনে, শেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে দুই হাত দিয়ে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় এনে শুইয়ে দিই। এমনি শিশুর মতো অবুঝ আর শিশুর মতো সরল আত্মভোলা লোক ছিলেন আমার দাদামশায়। একটা কামিজের উপর আর একটা কামিজ উল্টো করে পরা, হাতে মোজার দস্তানা দড়ি দিয়ে বাঁধা, এই ছিলো তাঁর বেশ। পড়ার আর লেখার বিরাম নেই আর তার মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে কোথায় যেন ডুব দিয়ে কি দেখে নিতেন। চোখের সামনে ভেসে উঠছে শান্তিনিকেতনের নীচু বাংলায় তাঁর সেই ঘরটি আর ঘরের সামনের বারান্দাটি। দেখতে পাচ্ছি চৌকির চারিদিকে কাঠের ফ্রেম মশারি দিয়ে ঘেরা। চৌকিতে বসে মোমবাতির আলোতে টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে গভীর রাত পর্যন্ত লিখে চলেছেন দাদামশায়। তখনো অন্ধকার গাছগুলোকে জড়িয়ে থাকতো যখন তিনি জবাগাছের কেয়ারির উপর দিয়ে ঘুরপাক খেতেন রোজ ভোরবেলায়। তারপরে বারান্দায় বড় চৌকিতে এসে বসতেন সামনের আর পাশের টেবিলে একরাশ খাতা বই নিয়ে। আমলকী গাছের তলায় আমলকী খসে খসে পড়ছে, তাদের

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গন্ধে বাতাস মন্থর, কাঠবেড়ালী ছাতুর লোভে দাদামশায়ের পিঠ বেয়ে দাড়ি বেয়ে উঠ্ছে। তিনি ডুবে আছেন লেখাতে আর পড়াতে ; পৃথিবীতে থেকেও যেন পৃথিবীর ন'ন। শান্তিনিকেতনে থাকবার সময় রোজই একবার তাঁর কাছে গিয়ে বসতুম। তখন আমি গান্ধীবাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছি। দাদামহাশয় ছিলেন গান্ধীজির পরম ভক্ত। প্রায়ই বলতেন, এতদিন বাদে একজন লোক এলেন যিনি আমাদের দেশকে বাঁচাবেন। বৃদ্ধ বয়েসে চরকা কাটতে সুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীবাদের সব কিছু মেনে নিতে পারেন নি, কোনো কোনো বিষয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন জেনে দাদামহাশয় ভারী ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলেন, বলতেন—রবি ঠিক বুঝতে পারছেন না, তিনি ধরতে পারছেন না গান্ধীর উদ্দেশ্য। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে তাঁকে চিঠি লিখতুম ইংরিজী শব্দের যুত্সই বাঙলার জন্যে। তিনি নতুন নতুন বাক্য রচনা ক'রে পাঠাতেন। একটি চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি : আমি ডানাভাঙা জটায়ুর মতো পড়ে আছি। তাঁর সেই কাঁপা-হাতের লেখা অমূল্য কয়েকখানি চিঠি আমার ছন্নছাড়া জীবনের ওলোটপালটের মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। তারপরে তাঁর মৃত্যুর পরে যতবার শান্তিনিকেতন গেছি একবার তাঁর সেই ঘরের কাছে না গিয়ে থাকতে পারিনি। জবাগাছগুলো অযত্নে মরে গেছে, শুধু আমলকী গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেই ঘর আর বারান্দার দিকে তাকিয়ে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ নীচু বাংলা কিনে নিয়েছেন অনেকদিন, তাঁরা কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের আবাসস্থলের শুচিতা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। সেবারে দাদামহাশয় প্রায় দু'মাস কলকাতায়

থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। সেই তাঁর শেষ কলকাতায় আসা।

কলেজে পড়ি তবু কলেজের বইয়ের সঙ্গে কতোটুকুই বা সম্বন্ধ! উজাড় করে পড়ে চলেছি বিশ্ব-সাহিত্য। শেরিডনের নাটক, অস্‌কার ওয়াইল্ডের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, রসেটির কবিতা, ইয়েট্‌সের কবিতা, এ,ই'র বইগুলো আরো কত কিছু পড়ে চলেছি। রসের জন্যে মনে তখন মরুভূমির পিপাসা জেগেছে। যতই রস জোগাচ্ছি মন সব টেনে শুষে নিচ্ছে, রসের তৃষ্ণা তার কিছুতেই মেটেনা, তার দাবীরও অন্ত নেই। তিনজন কবি এই সময় আমাকে পেয়ে বসলেন, অবিশ্যি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে। আলোবাতাস যেমন নিত্যসহচর, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান ছিলো আমার নিত্যসহচর। তাঁর কবিতা ও গানের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ছিলো আমার প্রাণের বাসা। যে তিন জন কবির কথা বলছিলেম, তাঁরা হলেন কীট্‌স, শেলী ও ব্রাউনিং। দু'একটী কবিতার মারফং তাঁদের সঙ্গে পরিচয় আগেই ঘটেছিলো, এখন ডুবে গেলুম তাঁদের কাব্যের রস-সমুদ্রে। কীট্‌সের সনেট আর ওড্‌গুলো আমাকে অভিভূত করে। একটি সনেট আমার বিশেষ প্রিয় ছিলো। আজও তার লাইনগুলো মনে জড়িয়ে আছে ঃ

The poetry of earth is never dead,
When all the birds are faint with the hot sun,
And hide in cooling trees, a voice will run,
From hedge to hedge about the new mown mead,
That is the grass-hopper's—he takes the lead !

In summer luxury,—he has never done
With his delights, for when tired out with fun
He rests at ease beneath some pleasant weed.
The poetry of earth is ceasing never :
On a lone winter evening, when the frost
Has wrought a silence, from the stove there shrills
The crickets' song, in warmth increasing ever,
And seems to one in drowsiness half lost,
The grass-hopper's among some grassy hills

পৃথিবীর কবিতা কখনো শেষ হয়ে যায় না। প্রখর রৌদ্রের তাপে অবসন্ন মূর্চ্ছাতুর পাখীরা যখন গাছের শীতল ছায়ায় লুকিয়ে বাঁচে তখন ঝোপ থেকে ঝোপে একটি সুর ছড়িয়ে যায় সদ্য-ফসল-কাটা মাঠের সম্বন্ধে। সে সুর হচ্ছে গঙ্গা-ফড়িংএর সুর—সবার আগে সুর ধরে সেই। গ্রীষ্মের প্রাচুর্যে তার আনন্দের শেষ পায় না সে। যখন কৌতুকলীলায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তৃণের তলায় আরামে করে সে বিশ্রাম। পৃথিবীর কবিতা কখনো থেমে যায় না। একটি নিঃসঙ্গ শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশা যখন নিস্তব্ধতা এনেছে চারিদিকে তখন আগুনের ধার থেকে ঝিল্লীর গান বেজে ওঠে তপ্ত হ'তে তপ্ততর সুরে। আর তন্দ্রায় নিজেকে আধা হারিয়েছে যে লোক তার কাছে ঝিল্লীর গান মনে হয় যেন ঘন ঘাসে ঢাকা পাহাড় থেকে ভেসে-আসা গঙ্গা-ফড়িংএর গান।

এই পৃথিবীর মাটির সঙ্গে কীট্‌সের অন্তরের যোগ ছিলো। তাঁর কবিতা কালো মাটির গন্ধে ভরপূর। শেলীর কবিতা যেন শুধু আলো দিয়ে বোনা, মাটির সঙ্গে তার যেন কোন সংস্পর্শ নেই।

যাত্রী

কীট্স মাটি-মায়ের আঁচল-ধরা ছেলে, বেদনা-কাতর, আর শেলী আকাশচারী বহু উর্ধ্ব থেকে সব কিছু দেখছেন। তিনি স্পর্শ করেন নি মন দিয়ে আমাদের এই কালো মাটির পৃথিবীকে। ভালোবাসি কালো মাটির বাসা এই পৃথিবী, ভালোবাসি তার গন্ধ, তাই ভালোবাসি কীট্সকে। শেলীর আকাশচারী অতিন্দ্রিয়তা মনকে বিস্মিত করে, অভিভূত করে আলোর বন্যায়। শেলীকে শ্রদ্ধা করি, তাঁকে ভালোবাসতে ভয় করে, বড্ড বেশী আলো। তাঁর Ode to Intellectual Beauty, Sensitive Plant, Prometheus Unbound, Adonis, ছোটোখাটো কবিতা-গুলো আমার সেই বাগানের ধারের একতলার দক্ষিণের ঘরে বসে কতো দিন দুপুরের নিস্তব্ধতায় মশ্‌গুল্‌ হয়ে পড়েছি। ওষুধ গেলার মতো করে আমি কখনো কবিতা পড়িনি। কবিতার বইগুলো হাতের কাছে সাজিয়ে নিয়ে বসলুম, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কবিতা পড়তেই হবে বলে যে কোনো একজন কবির কাব্যগ্রন্থ খুলে সুরু করলুম পড়া, এই ধরণের রসের ব্যভিচার আমি কখনো বরদাস্ত করতে পারিনি। মনের মধ্যে থেকে তাগিদ এসেছে কবিতার জন্যে। মন ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছে—শুকিয়ে গেলুম, রস ঢালো, তৃষায় মরছি—তখন অন্তরের তাগিদে কবিতা নিয়ে বসেছি। যখন ব্রাউনিং পড়তে সুরু করলুম তখন কীট্স্‌, শেলী সব সরে গেলো মন থেকে। এত ভালো লাগলো ব্রাউনিংয়ের কবিতা, দিনরাত নেশার মতো পড়েছি। কলেজে, বাড়ীতে সব সময় ব্রাউনিংয়ের কবিতা আমার সঙ্গে থাকতো। ব্রাউনিংয়ের যে কত বিভিন্ন সংস্করণ সংগ্রহ করেছিলুম সে সময়ে! ব্রাউনিংয়ের এমন একটি কবিতা আছে কিনা জানিনে যা আমি পড়িনি।

যাত্রী

পরে যখন রসের অন্দরমহলে কুলুপ দিয়ে নেমে এলুম বাস্তব জীবনের কড়া রোদে তেতে-ওঠা সংঘাতের ধুলোর মধ্যে, গান, কবিতা, বাঁশী অভিমানিনী প্রিয়ার মতো মুখ ফেরালো আমার দিক থেকে, তখন সংঘাতের ফাঁকে ফাঁকে কর্মের অবসরে এক একদিন বুঝতে চেষ্টা করেছি কেন কীট্‌স্, শেলী, বায়রণ প্রভৃতি কবিদের কবিতাকে ছাপিয়ে ব্রাউনিং এতো ভালো লেগেছিল। ব্রাউনিংয়ের কবিতায় কীট্‌সের কবিতার মৃত্তিকার গন্ধ নেই আর না আছে তাতে শেলীর অতিন্দ্রিয় আলোর অপূর্বতা। ব্রাউনিংয়ের অধিকাংশ কবিতা একটু ভারী, শেলী ও কীট্‌সের কবিতা যেমন আলোর মত হাল্কা তেমনি হাল্কা আদবেই নয়! ব্রাউনিংয়ের কবিতায় Moral Ideaর দাপটের সামনে মানুষ, পৃথিবী সব যেন গৌণ হ'য়ে গেছে। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় Moral Idea তাল ঠুকছে, আর তার ধ্বনি কানে বেসুরো বাজছে। কবিতাগুলো বেশী intellectualised, হৃদয়াবেগের রসে ততটা নিটোল নয়, যতটা Moral Ideaর ধার্মিকতায় অনুপ্রাণিত। তবু কেন ব্রাউনিংয়ের কবিতা এতো ভালো লেগেছিলো, আর বিশেষ করে সেই কিশোর বয়সে যখন হৃদয়াবেগের জোয়ারে প্রাণ কানায় কানায় ভরপুর, মন রঙের নেশায় মাতাল? আমার মনে হয় একটি বিশেষ কারণে ব্রাউনিংয়ের কবিতা আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। সবল, সংঘাতশীল, জয় সম্বন্ধে অসংশয় যে সুর ব্রাউনিংয়ের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার সুর, সেই সুর আমারও প্রাণের সুর। ব্রাউনিংয়ের প্রাণে আশার অন্ত নেই, হোক্ না সে Moral Ideaর সুনিশ্চিত জয় হবে তার আশা, তবুও সে আশা তো! আমার মনেও সংশয় নেই, জিতবোই আমরা, অন্ধকার হার মানবেই

আলোর কাছে, সে আলোর নাম Moral Ideaই হোক্, সৌন্দর্যই হোক্ আর যাই হোক্। আমার হার-না-মানা মনের সুরের সঙ্গে ব্রাউনিংয়ের কবিতার এই প্রবল নিঃসংশয় আশার সুর অতি সহজ আত্মীয়তায় মিলে গিয়েছিলো, তাই এত ভালো লেগেছিলো কবিতাগুলি। পিপার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমারও মন বার বার বলছে—'All's right with the world'! যতোই কলুষ উপরে জমা থাকুক না কেন, এ কলুষ সরে যাবেই যাবে। ব্রাউনিংয়ের মতে ভগবান দূর করবেন এ কলুষ, আমার মতে মানুষ। কলুষ আছে, ক্ষুদ্রতা আছে, স্বার্থপরতা আছে জানি, তেমনি দেখেছি মানুষের অতল নিঃস্বার্থপরতা, অভ্রভেদী মহত্ব, অসীম উদারতা। তাই জীবনের ঢেউ তুফানের তলায় দৃষ্টি অবগাহণ করে নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে—'All's right with the world'। ব্রাউনিংয়ের 'Prospice' কবিতাটি আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। মনে মনে আওড়ে যেতুম ঃ

"I was ever a fighter, so—one fight more,
The best and the last!
I would hate that death bandaged my eyes, and forbore,
And bade me creep past,
No! let me taste the whole of it, fare
like my peers
The heroes of old,
Bear the brunt, in a minute pay glad
Life's arrears
Of pain, darkness and cold."

আর আশার আলোতে জ্বল্‌জ্বল্‌ তাঁর সেই লাইনগুলো কতবার কত অন্ধকার দিনে আমার মন ভরে দিয়েছে আলোতে :

"One who never turned his back, but
  Marched breast forward,
Never doubted clouds would break,
Never dreamed, though right were worsted,
    Wrong would triumph,
Held we fall to rise, are baffled to fight better,
    Sleep to wake."

এই সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের মিল আশ্চর্য, তাই সেই কিশোর বয়সে ব্রাউনিংয়ের কবিতা আমাকে এতো মাতিয়ে তুলেছিলো।

দু'বছর কেটে গেল কলেজে। ১৯১৯ সালে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে থার্ড ইয়ারে উঠলুম। এবারে দু'একজন গুণী অধ্যাপকের সঙ্গ পেলুম, কলেজের পড়া আগের মতো আর ততোটা নীরস ঠেকলো না। প্রফুল্ল ঘোষ আমাদের সেক্সপীয়র পড়াতেন, আর ইংরাজী কবিতা পড়াতেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের কাছে পড়ে আনন্দ পেতুম। মনোমোহন ঘোষ তখন অধ্যাপনা করেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। আমার ইংরেজীতে অনার্স ছিলোনা, আমি নিয়েছিলুম ইকনমিক্‌সে অনার্স। তবু মনমোহন ঘোষ শেলী পড়াতেন সেই টানে আমি তাঁর ক্লাশে যোগ দিতুম, লোভ ঠেকিয়ে রাখতে পারতুম না।

আমার জীবনের ধারাটা এ পর্যন্ত যেদিকে বয়ে চলেছিলো সেটা পলিটিকাল-সমুদ্র-অভিমুখী বলা চলে না। দেশকে

ভালোবাসতুম, বিদেশী শাসনের উপর অন্তর থেকে ঘৃণা ছিলো, বিদ্বেষ ছিলো, তবুও যাকে পলিটিকাল বলে সেটা আমি ছিলুম না। দেশের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে আমার কোনও প্রত্যক্ষ যোগ তখনও ছিলো না। তখনও বাস্তবতার পরুষ পরশ আমার জীবনকে আঘাত করেনি। বয়সটা ছিলো কাঁচা, আর আমার দেশাত্মবোধ ভাবের রসের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিলো, তৃপ্ত ছিলো। দেশের প্রতি ভালোবাসা তখনো কর্মের মধ্যে মুক্তি পেয়ে সার্থক হয়নি। এক কথায় তখন পর্যন্ত আমার জীবনটা ছিলো ভাব-রসের আলোতে ফুটে-ওঠা মাটির সম্বন্ধহারা একটি অর্কিড।

এমন সময় ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হলো কলকাতায়। তার কিছু কাল আগে লালা লজপৎ রায় আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। তিনি হলেন এই বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি। সেবারে গানের দলের ভার নিয়েছিলেন অমলা দাশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বোন। তিনি এসে আমাদের ভাইবোনদের টেনে নিলেন তাঁর গানের দলে। লালা লজপৎ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লোকমান্য তিলক, মালবীয়জী, আরো অনেক নেতা ও বক্তা বক্তৃতা দিলেন। লালা লজপৎ রায়ের বক্তৃতা খুব ভালো লাগলো, যেমন ছিলো তাঁর বলার ভঙ্গী তেমনি জোরালো তাঁর বক্তৃতা। দেশ তখন পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের ব্যথায় কাতর, প্রতিহিংসার আগুন তা'র বুকে জ্বলছে অথচ পথ খুঁজে পাচ্ছে না। নেতাদের বক্তৃতায় এই দুই সুরই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। সব শুনেও মনে হচ্ছিলো আসল কথাটা যেন বাকী থেকে গেলো, কেউ যেন আসল কথাটা

ধরতে পারছেন না, তাই বলতেও পারছেন না। ভিতরে বক্তৃতা চলেছে, এমন সময় বাইরে থেকে জয়ধ্বনির আওয়াজ কানে এলো। ছোট্ট একটি মানুষ এসে ঢুকলেন, তুমুল জয়ধ্বনি ঠেলে দ্রুতপদে উঠলেন গিয়ে মঞ্চে, মিলিয়ে গেলেন নেতাদের ভিড়ে।

গান্ধীজিকে আমি প্রথম দেখি যখন স্কুলে পড়ি। স্কুলে একদিন শুনলুম গান্ধীজি কলকাতায় আসছেন সেদিন দুপুরে। কে তিনি, কি তিনি, কিছুই জানতুম না। সেই প্রথমবার শুনলুম যে আফ্রিকায় তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছেন। স্কুল থেকে পালিয়ে দু'টি বন্ধু আমরা হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত। গান্ধীজি এলেন, ঘোড়া-গাড়ীর ঘোড়া খুলে লোকেরা গাড়ী টানতে লাগলো। আমরা দু'টি বালক জুতো হাতে নিয়ে খালি পায়ে গাড়ীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এলুম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে। গান্ধীজি সমাজের ভিতরে ঢুকলেন আমরা দুজনে স্কুলে ফিরে গেলুম। সেটা যে কোন সাল তা আমার ঠিক মনে নেই। তারপর বছর কেটে গেছে গান্ধীজির কথা একেবারে ভুলে গেছি। হঠাৎ তাঁর নাম বিদ্যুতের মতো ঝলক দিয়ে উঠলো। কাগজে দেখলুম রাওলাট বিলের প্রতিবাদে তিনি পাঞ্জাব যাচ্ছিলেন, তাঁকে যেতে দেওয়া হয়নি, গ্রেপ্তার করে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে গভর্মেণ্ট। সমস্ত দেশ গর্জে উঠলো, সহরে সহরে হরতাল, পাঞ্জাবে জনসাধারণের বিক্ষোভ আর ডায়ারী হত্যাকাণ্ড। তখন থেকে গান্ধীজির নাম শোনা যেতে লাগলো, আফ্রিকায় তিনি যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালিয়েছিলেন তা'র ইতিহাস তখন ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলো।

যাত্রী

সেই কংগ্রেসে অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব আনলেন গান্ধীজি। তাঁর সেই বক্তৃতা কখনো ভুলবো না। তাঁর আগে অনেক নেতার বক্তৃতা শুনেছিলুম, তাঁদের বক্তৃতার বাক্-চাতুরী আর অনায়াস-গতি তারিফ না করে পারিনি, তবু তাঁদের বক্তৃতায় মন ভরেনি, কি যেন কি একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিলো। গান্ধীজি বক্তৃতা সুরু করলেন। বক্তৃতার সুর উঠ্‌লো না, নামলো না। কোনো হাতনাড়া নেই, কিংবা অঙ্গ-সঞ্চালন নেই। প্রাণের ভিতর থেকে কথা আসছে। প্রাণের সাম্‌নাসামনি হ'য়ে কথা যেন তার সমস্ত প্রগল্‌ভতা খুইয়ে বসেছে। কিন্তু সেই নিরাভরণ কথার কি আশ্চর্য শক্তি! সমস্ত শরীর থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। পাশের লোকদের দিকে তাকাতে সাহস হয় না, পাছে তা'রা আমার এই অবস্থা দেখে ফেলে। সে কি অসহ্য অসোয়াস্তি মনে! এত প্রবল সেই অসোয়াস্তি যে সেই বেদনা দৈহিক ব'লে মনে হ'তে লাগলো। কিছু একটা করতে পারলে যেন বেঁচে যাই। গান্ধীজি ব'লে চল্লেন আর আগুনের হল্‌কার পর হল্‌কা এসে বুকে বিঁধতে লাগলো। বক্তৃতা শেষ হবার পর যখন উঠ্‌লো জয়ধ্বনি, আমি তখন সোজা বের হ'য়ে পড়্‌লুম রাস্তায়, সুরু করলুম হাঁটতে। হন্‌হন্ ক'রে রাস্তার পর রাস্তা হেঁটে চলেছি, মনের মধ্যে যে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন গান্ধীজি তার দাহ থেকে রক্ষা পেতে। বক্তৃতা শুনে এরকম অসহনীয় অবস্থা আমার আর একবার হয়েছিলো উনিশ শো আটাস সালে মস্কোতে ট্রট্‌স্কির বক্তৃতা শুনে।

মনে আর কোনো সংশয় রইলো না। সেই দিনই স্থির করলুম যে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে

হবে। কোথায় ভেসে গেলো অক্‌স্‌ফোর্ড যাওয়ার কল্পনা! গান্ধীজির বক্তৃতায় সমস্ত জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। অতীতের সব খেয়াল মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে কোন ক্ষোভ হোলোনা, বরঞ্চ আবর্জনা সরে যেতে মন হাল্‌কা হ'য়ে গেলো, ভরে গেলো আনন্দে। নিজের দিক থেকে বাধা কিছুই রইলো না বটে, বাড়ীর নিষেধ কিন্তু যে কি প্রবল রূপ নেবে তা জানতুম বলে মনে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আমাদের পরিবারের কেউ কোনো দিন প্রত্যক্ষভাবে পলিটিকাল কর্মক্ষেত্রে নেমে আসেন নি। ভাবের রস দিয়ে, চিন্তার বীর্য দিয়ে তাঁরা স্বাদেশিকতাকে পুষ্ট করেছেন। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ দেশবাসীকে আমাদের সংস্কৃতির যথার্থ ঐশ্বর্য কোথায় রয়েছে সেটা তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন আর দেশের প্রতি যথার্থ ভালবাসা কাকে বলে সেটাও তাঁরাই দেশবাসীকে বুঝিয়েছেন। জাতীর আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত করতে তাঁরা যা করেছেন তার সম্যক ধারণা এ দেশের লোকের এখনো নেই। তবুও পলিটিকাল কর্মী বলতে যা বোঝায় তা আমাদের পরিবারে কেউ কোনোদিন ছিলেন না। আমার সিদ্ধান্ত যে তাঁদের কাছে কি রকম খাপ্‌ছাড়া লাগবে তা আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম। তাছাড়া আমার উপর আমার গুরুজনদের স্নেহের অন্ত ছিলো না। সবাই অজস্র স্নেহ ঢেলে দিতেন আমার উপর। তাঁদের এই আশাও মনে ছিলো যে বাড়ীর ধারা হয়তো কিছুটা আমাকে দিয়ে বজায় থাকবে। আমার মনে সবচেয়ে বেশী দুশ্চিন্তা ছিলো আমার পিতার সম্বন্ধে। আমাকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন। জানতুম তিনি

অসীম দুঃখ পাবেন আমার সিদ্ধান্ত শুনে, আর সেই দুঃখ সব নিজের ভিতরে টেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে যেতেও দেবেন আমার পথে তাও জানতুম। মনের মধ্যে তোলপাড় চল্‌তে লাগলো। নিজেকে তৈরী করে নিতে মনের ভিতরটা ক্ষতবিক্ষত করে ফেল্‌লুম। তারপরে একদিন দুপুরে তিনি যখন বিশ্রাম করছিলেন তখন তাঁর কাছে গিয়ে আমার মনের সংকল্পের কথা সব খুলে বল্লুম। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, পরে বল্লেন,—অন্য পথ দিয়ে কি দেশের কাজ করা যায় না? বল্লুম,—যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার পক্ষে এই পথই একমাত্র পথ। আমাকে যেতে দাও আমার পথে। আবার চুপ করে রইলেন, পরে বল্লেন,—তোমাকে ধরে নিয়ে গেলে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হবে, আর কতো দিনই বা আমার বাকী আছে, আমার মৃত্যুর পর তুমি ও পথে গেলেই তো পারতে? বুকের ভিতরটা চৌচির হ'য়ে ফেটে যাচ্ছিলো, তবু উপায় ছিলো না। বের হ'তেই হবে পথে আর চরম মূল্য না দিয়ে কি পথে বের হবার জো আছে? শেষ পর্যন্ত বল্লেন,—তুমি আমাকে কথা দাও যে এখুনি এমন কিছু করবে না যাতে তোমাকে ধরে নিয়ে যায় আর কলেজের পড়া তুমি এখুনি বন্ধ করে দেবে না। তাঁকে কথা দিলুম যে জেলে যেতে হয় এমন কিছুই আমি করবো না আর কলেজ ছাড়বো না। তা' ছাড়া কলেজ ছাড়ার নির্দেশে আমার মন সায় দেয়নি। আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছিলুম না যে কলেজ বন্ধ হয়ে গেলে গভর্মেণ্টের কি ক্ষতি হবে! বরাবরই তো শুনে আসছিলুম যে বিদেশী গভর্মেণ্ট যাতে

আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসার না হয়, তার জন্য বাধা দিয়ে এসেছে। আমরা কলেজ স্কুল বয়কট করলে তাদের খুসি হওয়া ছাড়া অখুসি হবার তো কোনও কারণ নেই। আমাদের কলেজে যখন কলেজ বয়কট নিয়ে মিটিং হোলো তখন আমি সেই বয়কটের বিরুদ্ধতা ক'রে প্রস্তাব আনি। আমার প্রস্তাব ছিলো এই যে আগে বহুসংখ্যক জাতীয় শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হোক্ তারপরে ছাত্রদের নির্দেশ দেওয়া হোক্ গভর্মেন্টের অধীন শিক্ষাভবনগুলিকে বয়কট করতে। আমার প্রস্তাব গৃহীত হয় আর আমার সহপাঠী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, অধুনা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক, তাঁর প্রস্তাব যে কলেজ বয়কট করা হোক্, পরাজিত হয়। তার কিছুকাল পরেই, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে নিখিল-ভারত-ছাত্র-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এর আগে নিখিল-ভারত-ছাত্র-সম্মেলন আর কখনো হয়নি। প্রেসিডেন্সি কলেজের তরফ থেকে নলিনাক্ষ সান্যাল আর আমি ডেলিগেট নির্বাচিত হই। আমাদের কনফারেন্সের সময়েই নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কলকাতা থেকে যে ট্রেনে আমরা নাগপুর যাই সেই ট্রেনেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙলা দেশের বহু ডেলিগেট নিয়ে নাগপুর যাচ্ছিলেন নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ নীতির বিরুদ্ধতা করবার জন্যে। কোথায় তলিয়ে গেলো দেশবন্ধুর সেই বিরুদ্ধতার সংকল্প! তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেন গান্ধীজির কাছে।

আমাদের ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন লালা লজপৎ রায়। কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতায় আমি বলি যে স্কুল কলেজ

ত্যাগ করা উচিত নয়। সর্বত্রই একই সময়ে ভিতর থেকে আর বাইরে থেকে গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধতা করতে হবে। আমার পরে বক্তৃতা দিলেন শ্যামা নেহেরু—বিপ্লবী বাঙলার প্রতিনিধির মুখ থেকে এই রকম অ-বিপ্লবী কথা শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন, বাঙালীর মুখ থেকে এরকম বিপ্লব-বিরোধী কথা বের হবে এ তিনি কখনো আশা করেন নি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর অশেষ দুঃখের বোঝা শ্লেষের রসে সিক্ত করে, আরো ভারী ক'রে আমার মাথায় চাপিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। বেচারী বাঙালী-সন্তানের তখন যা অবস্থা!

উনিশ সো উনিশ সাল শেষ হ'য়ে এলো। ডিসেম্বর মাস, উত্তরে হাওয়ার দৌরাত্ম্যে আমাদের বাগানে সিসু গাছ, চাঁপাগাছ সব পাতা খুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিগম্বর সন্ন্যাসী সেজে। রজনীগন্ধা আর গাঁদাফুলের রেষারেষি চলেছে বাগানে কে কতো ফুল ফোটাতে পারে। শিউলি গাছে দু'চারটে শিউলি কি জানি কি মনে ক'রে তখনো এসে হাজির হচ্ছে মাঝে মাঝে। এমন সময় উঠ্‌লো ঝড়, আকাশ-পাতাল-তোলপাড় করা ঝড়। বাইরে নয় কিন্তু—আমার অন্তরে।

কৈশোরের গোধূলি তখন সবে মাত্র বিলীন হচ্ছে যৌবনের স্বপ্নময়ী নিশীথিনীতে। সে এক আশ্চর্য সময়। রক্তের মৌমাছি স্বপ্নের মৌচাক বেঁধেছে বুকে, হুল ফুটোচ্ছে পাঁজরগুলোতে, প্রিয়ার স্বপ্নের মধু ঢালছে আমার শিরায় শিরায়। কৈশোর-যৌবনের গোধূলি-রাত্রির ধূপছায়া রঙ্গে রাঙ্গা সেই প্রিয়ার কি তুলনা আছে? সে প্রিয়া এই পৃথিবীর হয়েও এই পৃথিবীর নয়, নাম জানি নে তার, সে আমার অনামিকা প্রিয়া। জীবনের

যাত্রী

একটা পরমাশ্চর্য ক্ষণে পুরুষেব বুকে এই প্রিয়ার পরশ লাগে। রক্তের মৌমাছি গুন্ গুন্ করে তার কথা বলে চলে পাঁজরের তলায় মনের কাণে কাণে। যৌবনের উষার সেই অনামিকা প্রিয়া কোন বিশেষ নারীর রূপ নিয়ে মনের আয়নায় তার ছায়া ফেলে না, তার রূপের অপূর্ণ আভাস নানা মানবীর মুখে নানা ক্ষণে দেখা যায়। কারো হাসিতে, কারো কালো ভুরুর মেঘের তলে চাহনির বিদ্যুৎ-ঝলকে, কারো কচি ধানের শীষের মতো নমনীয় দেহভঙ্গিতে সেই অনামিকা প্রিয়ার রূপের খণ্ড ও চকিত আভাস ধরা পড়ে। রক্তের মৌমাছি তখন আনন্দবেদনায় বেপরোয়া হয়ে হুল ফুটোতে থাকে পুরুষের বুকে।

আমি যে বাড়ীর আবহাওয়ায় মানুষ সেখানে রসবোধের অভাব ঝুটো বৈরাগ্যের তলায় আত্মগোপন করে সাধুগিরির ঢঙ করে আত্মপ্রবঞ্চনা করে নি। ক্ষীণজীবিদের বৈরাগ্য-বিলাস এ বাড়ীর মানুষেরা মানতেন না। দেহে এবং মনে ছিল এঁদের প্রচণ্ড শক্তি, বিচার বুদ্ধি ছিল তরোয়ালের মত ধারালো, রস-বোধ ছিল অনুপমেয়। রস-বোধের দৈন্যকে বৈরাগ্যের গেরুয়া পরিয়ে আধ্যাত্মিক সাজাবার চেষ্টা এঁরা কখনো করেন নি। অথচ এই রস-বোধই করেছিল এঁদের সত্যিকার বৈরাগী। রসের গভীরতা ও শুচিতাবোধ ছিল এঁদের অসামান্য, সংযম ছিল এঁদের সেই রস-বোধের সহজ অভিব্যক্তি। অসংযমের দ্বারা রসকে ঘেঁটে তার তলানি নিয়ে ভাবুনেগিরি করা আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ীর ধারা ছিল না। আমি সেই আবহাওয়ায় মানুষ। রসকে আমার মন কখনো অস্বীকার করে নি। সবল শরীর ও সহজ মন দিয়ে আমি গ্রহণ করেছি সব রসানুভূতিকে। রক্ত যখন

যাত্রী

প্রিয়ার স্বপ্নের আল্পনা এঁকেছে মনে, তখন আনন্দে ভরে গেছে বুক। কবিতা দিয়ে, গান দিয়ে, বাঁশী বাজিয়ে আমার সেই মানসী প্রিয়ার মন ভোলাবার জন্যে কতো না চেষ্টা করেছি সে দিন।

কৈশোরের প্রদোষ তখন সবে বিলীন হয়েছে যৌবনের প্রথম আলোকে এমন সময় মানসী প্রিয়ার অ-ধরা রূপের ছায়া দেখলুম এক মানবীতে। স্বপ্নের খেয়া, রসের নায় এসে ঠেক্‌লো বাস্তবের ঘাটে, রূপের কূলে। শীতের দিন, হিমের রাত্রি মনের ফাগুনের রঙে রাঙা হোয়ে উঠ্‌লো। হৃদয়ের বালির চর ডুবে গেলো অনুরাগের জোয়ারে। নারীর দেহ ও মনের সংস্পর্শ পেলো আমার দেহ ও মন সেই প্রথম। সেই প্রথম মিলনের বিস্ময় ও আনন্দের তুলনা নেই ত্রিভুবনে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অসীম শূন্যে নিঃসঙ্গ তারা ঘুরতে ঘুরতে যখন একদিন আর একটি তারার কাছে এসে পড়ে তখন পরস্পরের প্রবল আকর্ষণে তারা কক্ষচ্যুত হয়ে ধাক্কা খায়, জ্বলে উঠে, উল্কা হয়ে ঝরে পড়ে আকাশ থেকে। তেমনি করে নিঃসঙ্গ আমার জীবন চল্‌তে চল্‌তে যখন অকস্মাৎ একদিন একটি মানবীর সাক্ষাৎ পেলো যাতে সেই প্রথম যৌবনের ভোরের আলোতে মানসী প্রিয়ার রূপ দেখতে পেলো মন, তখন জ্বলে উঠ্‌লো আমার দেহমন। কোন বাধাই মানলো না মন সেদিন। ঘরের ও বাইরের প্রবল আপত্তি উজার হয়ে গেল অন্তরের সেই বিস্ময় ও আনন্দের কাছে। কাছের লোকেরা বিস্মিত হলেন, দুঃখ পেলেন। আমার উপরে এঁদের স্নেহের অন্ত ছিলো না। তাঁরা আমার আবেগের প্রাবল্যকে বুঝতে পারলেন না। তাঁদের প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার এই কূল-ডোবানো আবেগের জোয়ার ক্ষণিকের মোহ বলে

ঠেক্‌লো। তাঁরা প্রাণপণ করতে লাগলেন যে অনুরক্তিকে তাঁরা মোহ ভাবছিলেন সেই মোহের কলুষ থেকে আমাকে বাঁচাতে। আমার মনপ্রাণ তখন ডুবেছে। কুল অকূল দুই পেয়েছে মন রসের আনন্দে, আর কিছুই বাকী নেই তখন নিজের। ফিরবো কোথা থেকে? ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের হাটের লোকেরা খুসি হলো। আমাদের বাড়ীর উপর তাদের চিরকেলে ঈর্ষার রসদ যোগালো আমার আচরণ। নিন্দার শিলাবৃষ্টি নেমে এলো আমাদের মাথার উপর। এই হাটের লোকদের মতামতের উপর আমার আজও কোন শ্রদ্ধা নেই, সে দিনও ছিল না। জিভের পিচকারী দিয়ে তারা যে কুৎসা ছিটালো তার বেশীর ভাগটা তাদেরই গায়ে পড়লো। আমি তখন জ্বলে উঠেছি দেহে ও মনে, সে আগুন তখন এদের দুর্বল পঙ্গু জিভের পিচকারী-নির্গত কুৎসার কাদাজল দিয়ে নিবোনো একেবারেই সম্ভব ছিল না। বাড়ীতে আবহাওয়াটা তখন থম্‌থমে হয়ে উঠেছে আমাকে ঘিরে। সেইটেই ছিল আমার পক্ষে অসহ্য। ভিতরটা হচ্ছিল ক্ষত বিক্ষত, বাইরে ছিল আমার জিদের বেপরোয়া ঠাট। বংশমর্যাদা, সমাজ এই সব দানবের ভয়ে ভীত আমার বাড়ীর লোকেরা আমার ভালবাসাকে মোহ বলে প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। কাছের লোক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ চিনতে পারে না আর সত্যিকরে তারা ব্যক্তির আপনার লোকও নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রক্তের সম্বন্ধ যার সঙ্গে সে আত্মিক অনাত্মীয়। নারী-মাংস-লোলুপতা আমার স্বভাববিরুদ্ধ, যেমন নারীকে দেবী বানিয়ে তাকে পূজো করার অভিনয় আমার রস-বোধের শালীনতায় বাধে। দেহকে মন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার নামই হোলো

কুলটাবৃত্তি। এই কুলটা মনোবৃত্তির উপর আমার মনের স্বাভাবিক বিরাগ চিরদিন। অথচ নারী মাত্রকেই শুধু মন বলে দেখ্‌তে হবে, ঝুটো বৈরাগ্যের এই রস-বিবর্জিত বস্তুহীন হিতোপদেশ চিরদিনই আমার কাছে অত্যন্ত খেলো বলে ঠেকেছে। দেহকে মনের সুরে বেঁধে নিতে হবে, মনকে দেহের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পুরুষ যেখানে প্রেমিক, নারী যেখানে প্রিয়া সেখানে দেহ ও মনকে প্রেমের আলোতে এক, অখণ্ড, অদ্বৈত-রূপে দেখাতেই রসবোধের চরম স্বার্থকতা। মানুষ যখন ভালবাসে তখন দেখেও তাই। সেদিন আমি সেই চরম সার্থকতার সন্ধান পেয়েছিলুম, তাই আমার মনে কোনো কুণ্ঠা ছিলো না। তবু একদিন আমাকে হার মানতে হোলো। হার মানতে হোলো মনের অনাত্মীয় কাছের লোকদের কাছে। তাইবা বলি কেন? হার মানলুম নিজের দুর্বলতার কাছে, নিজের কাপুরুষতার কালি দিয়ে ভালবাসার মুখে কালি দিলুম। বুকের মধ্যে সেদিন কি তোলপাড়, পাগলা ঢেউয়ের কি মাতামাতি! পাঁজরগুলো নুয়ে গেলো বেদনার ঢেউয়ের ঘায়ে, নিজেকে ধিক্কার দিলুম। ভালবাসার মান আমি রাখতে পারি নি। ভালবাসার কাছে ক্ষমা চাইলুম আমার দুর্বলতার জন্যে, আমার অক্ষমতার ঢেউয়ে আমিই সরিয়ে দিলুম তাকে যে আমার জীবনে প্রথম প্রেমের আলো। জীবন আমার ভরপুর আলো থেকে ঘন অন্ধকারের মধ্যে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো। বুকের সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমার জীবন মুখ গুঁজে পড়ে রইলো। আমার জীবনের সমস্ত গতি সেদিন স্তব্ধ, প্রাণের সমস্ত অনুভূতি অসাড় হোয়ে গেলো ঘন বেদনায়। মাঝ

যাত্রী

নদীতে হঠাৎ ঝড় ওঠে এক এক দিন, তখন সোনার আলোতে ভরপূর ঢেউয়ের রঙ, তরঙ্গের ললিত ভঙ্গি সব বদল হয়ে যায় অকস্মাৎ। ঝড়ের ঝাঁকুনি আর ঢেউয়ের ক্রুদ্ধ আঘাতে নৌকো ক্ষতবিক্ষত হয়, তার পাল ভেঙ্গে পড়ে, দাঁড় যায় ভেসে, হাল হয় অচল। নৌকাটিকে নাজেহাল কোরে, নাস্তানাবুদ কোরে ঝড় ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে একদিন তীরের পাশে পৌঁছে দিয়ে সরে পড়ে কৌতুকভরে। নৌকা টেরই পায়না সে কোথায় এসে পৌঁচেছে। তীব্র ব্যথায় অসাড় আমার জীবনের অবস্থা সে দিন এই হাল-ভাঙ্গা, ঝড়ের ঝাপ্‌টা-খাওয়া নৌকরই মত। কখন সে ঝড় ধাক্কা দিতে দিতে আমাকে তীরের কাছে এনেছে, তার কোনো চেতনা সেদিন ছিল না আমার। নিজের উপর ধিক্কারের গ্লানিতে, লজ্জাতে, ব্যথাতে জীবন তখন একেবারে অসাড়, নিঃঝুম। কখন জানিনা ব্যথার আঁধিতে ঘুরপাক খেতে খেতে অন্ধ জীবন-তরী তীরের কাছে এসে পড়েছিলো নিজের অজানিতে। সে তীর যে কোন্ তীর সেটা বোঝবার মত অবস্থাও ছিলো না তখন আমার মনের। অসহ ব্যথার অসাড়-করা বন্ধন থেকে মন যখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো তখন তীরের দিকে দৃষ্টি পড়লো, তীরটাকে চিনতে পারলুম। দেখলুম আমার বেদনার ঝোড়ো হাওয়া আমাকে সকল মানুষের বেদনার তীরে পৌঁছে দিয়েছে। যখন ব্যথা বুকের ভিতরে ঝরণার মুখ-আটকানো পাথর সরিয়ে দিলো তখন মানুষের উপর আমার প্রাণের সহজ দরদ উপ্‌চে পড়লো শতধারে। প্রাণের বন্ধ তালা যখন খুলে দিলো গভীর বেদনা, তখন দেখলুম মানুষের উপর

যাত্রী

পরম বিশ্বাসের মাণিক জ্বলছে প্রাণের সেই মণি-কুঠরীতে। ব্যথা আমাকে অবিশ্বাসী করেনি মানুষের সম্বন্ধে। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোর পাপ থেকে, অবিশ্বাসের অপমৃত্যু থেকে আমার ব্যথা আমাকে বাঁচিয়ে ছিল। দরদ ও বিশ্বাসের তীরে আমাকে পৌঁছে দিয়ে ব্যথার ঝড় দিগন্তে মিলিয়ে গেলো।

তীরে সবে এসে উঠেছি এমন সময় ভারতবর্ষের আকাশে ঝড়ের ঢেউ তুলে এলেন গান্ধীজি। এ ঝড়ও নিছক বাইরের আকাশের ঝড় ছিলো না, অন্তত আমার মনের কাছে দেখা দেয়নি এই ঝড় সেইরূপে। এ ঝড় আমাকে নিজের বাইরে বেরিয়ে আসবার পথ দেখালো। মানুষের উপর দরদ শুধু ভাবরসের সামগ্রী করে না রেখে, কেমন করে নিরলস কর্মের দ্বারা তাকে শুদ্ধ করে নিতে হয়, তাকে বিকশিত করতে হয় প্রতিদিনকার জীবনে, সেই বিস্ময়কর চেতনা গান্ধীজি পৌঁছে দিলেন আমার প্রাণের সেই কুঠরীতে যে কুঠরীর বন্ধ দরজার তালা ব্যথার আঘাতে সবে মাত্র ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। বিরাট বেদনাবোধের স্রোত বইয়ে দিলেন প্রাণের মধ্যে গান্ধীজি। যে ব্যথা শুধু একান্ত আমার, তার উপর দিয়ে বয়ে গেলো সেই স্রোত। আমার ব্যথাকে এই বিরাট বেদনাবোধের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আমি বাঁচলুম।

নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের ডাক হিসেবে গান্ধীজির ডাক সেদিন আমার প্রাণে এসে পৌঁছয়নি। আমার প্রাণের ঘুমনো সুরগুলোকে জাগিয়ে দিয়েছিল গান্ধীজির ডাক। তাই আমার প্রাণ এমন সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করেছিলো তাঁর ডাকের কাছে। নিছক রাজনৈতিক ডাকের কাছে আমি কখনো

আত্মসমর্পণ করতে পারতুম না। যাকে রাজনৈতিক লোক বলে মূলতঃ আমি তা' নই। পরে যখন রাজনীতির আসরে কোমর বেঁধে নেমে এসেছি তখন নানা ঘটনা আমার কাণ মলে বার বার আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে যে আসলে আমি রাজনৈতিক লোক নই। রাজনৈতিক চালবাজীতে ওস্তাদ বহু লোকের কাছে আমি বহুবার ঠকেছি। তারা খুসি হয়েছে ভেবে—কেমন হার হোলো ওর আমাদের কাছে! কিন্তু আমি এদের কাছে হারিনি কখনো। হার শুধু নিজের দুর্বলতার কাছে ঘটে, আদর্শের তপস্যার তাল কাটলেই হার আর হার নেই। আদর্শের তপস্যার তপোভঙ্গ করে ক্ষুদ্র লোভের অপ্সরা। আমার মধ্যেও ছোট লোভ আছে নানা বিষয়ে, কিন্তু এক জায়গায় আমি খাঁটি। আমি যে আদর্শকে আমার জীবনের কেন্দ্রে বসিয়েছি, তার কাছে আমি কখনো সত্যভঙ্গ করিনি। কোনও ব্যক্তিগত লোভ ক্ষণিকের জন্যেও তার কলুষ নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় আমার আদর্শকে অশুচি করেনি, ম্লান করেনি। আর এই জায়গায় আমার জীবনে মহাত্মাজীর দান অসীম। তাঁর টানের মতো এমন প্রবল, একনিষ্ঠ, নির্লোভ, সমগ্র-জীবন-ছোঁয়া টান না এলে যাকে অল্পবুদ্ধি লোকেরা ভুল করে রাজনৈতিক পথ বোলে থাকে সেই পথে এসে আমি দাঁড়াতুম কি না আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আগেই বলেছি যে যাকে রাজনৈতিক ব্যক্তি বলা চলে সে লোক আমি নই। সাময়িক সাফল্যের অপদেবতার পায়ে আমার আদর্শকে বলি দিতে আমি কখনো রাজী হই নি। রাজনীতির হাটে চোরা-কারবারীর অন্ত নেই। বুদ্ধিমান লোকেরা রাজনৈতিক চোরা-

কারবারের তারিফও করে থাকে। রাজনীতির চোরাকারবারীদের হাতে জীবনে বার বার নাস্তানাবুদ হোয়েছি, প্রবঞ্চিত হয়েছি। এদের হাটে আসর জমাতে গেলে যে বুদ্ধির প্রয়োজন সেই পাটোয়ারী বুদ্ধি আমার নেই এটা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই। অনেকদিন থেকেই রাজনৈতিক চোরা-কারবারীরা যে আমাকে অবজ্ঞা-মেশানো করুণার চোখে দেখে থাকে তাও আমি জানি। তবু আমি নিরুপায়। যে বাড়ীতে আমি জন্মেছিলুম সেখানে এমন সব লোক আমি দেখেছি আর তাঁরা তাঁদের জীবনের ছোঁওয়া দিয়ে এমন কোরে আমার মনের তার বেঁধে দিয়েছেন যে তা'র সুর নামিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই পাটোয়ারী বুদ্ধির প্রয়োগ করা আমার সাধ্যের বাইরে। তাই জার্মান ভাষায় যাকে বলে 'রিয়াল পলিটিকার' অর্থাৎ কিনা বাস্তব রাজনীতির পাটোয়ারী, তা' আমি কখনো হয়ে উঠতে পারলুম না।

মহাত্মাজীর ডাক এলো। তাঁর ডাকের আলোয় দেশের বুক-জোড়া অন্ধকার কেঁপে উঠ্‌লো আলো ফুটে উঠ্‌তে লাগলো যেখানে আগে নিশ্চিন্তে থিতিয়ে ছিলো অন্ধকার। তাঁর ডাকেতে কোটি কোটি লোকের অনাহার, নিষ্পেষণ ও অপমানের দুঃখ ধ্বনিত হোলো আর বেজে উঠ্‌লো তারই সঙ্গে সেই অনাহার আর অপমান দূর করবার আশার সুর। মানুষের সমস্ত জীবনটা, গোটা মানুষটাকে ধরে নাড়া দিলেন মহাত্মাজী। কি সহজ ও গভীর সেই আবেদন! এমন সহজ ও শক্তিমান ভাষায় কোটি কোটি লোকের প্রাণের কথা গান্ধীজির আগে এ দেশের কোন নেতা কোন দিনও বলেন নি। তাঁদের কথা শুনলে কিম্বা পড়লে

মনে হোতো যে কথাগুলো যেন আকাশ থেকে ঝুলে রয়েছে, আসমানের ফুল তারা, মাটির সঙ্গে কোনোই সম্বন্ধ নেই যেন তাদের। এই নেতাদের সঙ্গে মাটির সম্বন্ধ সত্যিকরে ছিলও না কোনো দিন, তাই তাঁদের কথায় মাটির গন্ধ আস্‌বে কোথা থেকে? ভারতবর্ষের মাটির গন্ধে ভরপূর গান্ধীজির কথা ও লেখা আমার প্রাণ ভরে দিলো তা'র সুবাসে। ছোটবেলায় আমি অনেকবার কংগ্রেসের অধিবেশনে গেছি। সেখানে সাজানো মণ্ডপে ইংরেজীতে বক্তৃতা হোতো। বক্তৃতার পরে মণ্ডপের বাইরে পেলিটির রেস্তোরাঁয় চা কেকের সন্ধানে নেতারা দৌড়তেন, আমরাও দৌড়তুম। সবটাই যেন ড্রইংরুমের মজলিশ বলে মনে হোতো। দেশের ধারণা তখন সত্যি করে কিছুই ছিলো না আমার। ইংরেজ-বিদ্বেষ, দু'চারটে স্বদেশী গান, রাখী-বন্ধন, টেরারিষ্ট কর্মীদের সম্বন্ধে রোমাঞ্চকর গল্প—এই ছিলো আমার পুঁজি দেশ-প্রীতির ঝোলায়।

এলেন গান্ধীজি, এক নিমেষে সব বদল হয়ে গেলো। দেশের লোক যথার্থ কারা, কোথায়, কাদের মধ্যে দেশের সত্যিকার শক্তি ঘুমিয়ে আছে, কেমন করে তাদের শক্তি জাগ্রত করে দেশ স্বাধীন করবার কাজে লাগানো যায় এ সব আমাদের দেখালেন আর শেখালেন গান্ধীজি। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বাস্তবতা-বিবর্জিত নিষ্ফল বক্তৃতার নাগপাশ থেকে স্বাধীনতা-আন্দোলনকে মুক্ত করলেন গান্ধীজি। গণ-সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন সমস্ত দেশজুড়ে শোনা গেলো। স্বাধীনতা-আন্দোলন মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক খিড়কির পুকুরে শ্যাওলার মতো ভাসছিলো এতো দিন। এবারে গণ-আন্দোলনের ঢেউয়ের

সোয়াড়ি করে এগিয়ে চল্‌লো আন্দোলন। কোথায় ভেসে গেলো মধ্যবিত্তদের সেই খিড়কির পুকুরের রাজনীতি! এই খিড়কির পুকুরের বদ্ধ জলের টানে আমি স্বাধীনতা-আন্দোলনে আসি নি। আমি এসেছি গণ-সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রবল টানে।

আমার মতো কতো তরুণের মনের আয়নায় ভারতবর্ষকে প্রতিবিম্বিত করলেন যে সেদিন গান্ধীজি তার ইয়ত্তা নেই। সেই প্রথম ভারতবর্ষকে চিনতে সুরু করলুম। বিলাসী বাবুদের ড্রইংরুমের ভারতবর্ষ এ নয়। লক্ষ লক্ষ কুঁড়ে ঘরে, বস্তিতে যে ভারতবর্ষ অনাহারে, উপবাসে, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন হোয়ে দিন যাপন করছে সেই ভারতবর্ষ আমার মুখোমুখি হোয়ে দাঁড়ালো। বুকের মধ্যে ভূমিকম্প হোয়ে গেলো। গান্ধীজি যে কি গভীর ও প্রবল বিপ্লব ঘটালেন সে দিন আমার জীবনে তা' বলে শেষ করা যায় না। ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক ও স্রষ্টা হোলেন গান্ধীজি।

কলেজে আমরা ক'টি বন্ধু স্থির করেছিলুম আমাদের পথ। বন্ধু চপলাকান্ত ভট্টাচার্য কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দেবার সংকল্প করেছিলেন, তিনি করলেনও তাই। আমি আরও কয়েক-মাস কলেজে থেকে গেলুম। বিদ্যালয়বর্জন নীতি আমি যে গ্রহণ করতে পারি নি সে কথা আগেই বলেছি। চপলার সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্বের বন্ধন ছিলো সে দিন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সে প্রায়ই আসতো, আমিও যেতুম তার বাড়ীতে। শ্যামবাজারে খালের ধারে বসে দুই বন্ধুতে অনেক জল্পনা কল্পনা করেছি। 'দেশ' নাম দিয়ে একটি সাপ্তাহিক কাগজ বের করবার কল্পনাও আমরা করেছিলুম সেই সময়। ত্রিশ বৎসর আগের

তার সেই বুদ্ধি-দীপ্ত তেজস্বী ও প্রশান্ত চেহারা আজও আমার মনে আছে। পরবর্তী কালে চপলা হোলো হিন্দু মহাসভার সমর্থক আর আমি হলুম কমিউনিষ্ট। আমার পথ সরে গেলো তার পথ থেকে। তবু তার প্রাণের দীপ্তি ম্লান হোয়ে যায় নি তখনো। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বর্তমান সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের মধ্যে সে দিনকার সেই তেজস্বী তরুণের এতটুকুও রেশ নেই, সেই বন্ধু নিঃশেষে হারিয়ে গেছে।

চলবার পথ স্থির করে নিলুম কিন্তু তখনও ভিতরের সঙ্গে বাইরের দ্বন্দ্ব মিটতে পারি নি। ভিতর ও বাইরের ছন্দ এক না করতে পারলে চলা যায় না। তা ছাড়া ভিতর আর বাইরে বলে দুটো আলাদা জিনিষ আছে কি?

একদিন ঝড়ের খড়্গ দিয়ে নিজের বুক চিরে দু'খানা কোরে দিলুম, ছুঁড়ে ফেলে দিলুম আমার সত্তার অত্যন্ত প্রবল একটি অংশকে অতীতের অন্ধকারে! এম্‌নি করে মিটলুম সেদিন আমার বাইরের সঙ্গে আমার ভিতরের দ্বন্দ্ব। আমার পক্ষে এটা বড়ো সোজা ছিলো না। আটপৌরে আবহাওয়ায় আমার জীবন বিকশিত হয় নি। জীবন দিয়ে, সাধনা দিয়ে বিরাট মানুষেরা যে আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন জোড়াসাঁকো বাড়ীতে এক শতাব্দী ধরে, তাঁদের তৈরী সেই আলো-বাতাসের বুকে আমার জীবন মেলে দিয়েছিলো তার দলগুলি। সেই অমিত-শক্তিশালী মানুষগুলি যে সুরে আমাদের পারি-বারিক জীবনের সুরের পর্দা বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই সুরের ফাঁক-তালে আমার জীবনের চলার ছন্দ ফেলা যে কি শক্ত ছিলো তা' যারা এমন বিশ্ববিজয়িনী শক্তির সম্মুখীন হয় নি

কোনদিন তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এস্‌থেটিক অনুভূতির সে এক আশ্চর্য গভীর, সীমাহীন আকাশ এই রসোপলব্ধির সাধকেরা রচনা করে রেখেছিলেন আমাদের জীবন ঘিরে। বাড়ীর বায়ুমণ্ডল ছিলো ভাবের রসে মন্থর, ভাবের গন্ধে উন্মন। সেই প্রবল, গভীর এস্‌থেটিক আবেষ্টনীর বিরুদ্ধে আমি ঘোষণা করলুম আমার বিদ্রোহ।

মন অবিশ্রান্ত এই প্রশ্ন কোরে চল্‌লো—কোথায় আলো, কোথায় সৌন্দর্য, কোথায় রঙ্‌, কোথায় রূপ? জীবনের কেন্দ্রে ঘন অন্ধকার। অত্যাচার ও নিপীড়নের বিষে মানুষের জীবন কালো, চোখের জলের আগুনে মানুষের জীবনের সব রঙ গেছে পুড়ে, জীবন হয়েছে পোড়া মাটি। জোড়াসাঁকো বাড়ীর শান্ত ভাব-ঘন আবহাওয়ার বাইরে যে জীবনের ধারে মহাত্মাজীর ডাক আমাকে পৌঁছে দিলো সেই জীবনের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আমার মন কেঁপে উঠ্‌লো, তার ভয়ঙ্কর ও অসহ্য প্রকাশ স্তম্ভিত করলো আমার মনকে, সৌন্দর্যের কথা উচ্চারণ করতেও লজ্জা বোধ হোলো। হায়রে সৌন্দর্য! জীবনের কেন্দ্রে অমারাত্রির নিবিড় অন্ধকার বিছানো, লোভ আর হিংসার পাঁকের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের বুক থেকে, জীবনকে করছে দুঃসহ।

মানুষের জীবনের কেন্দ্রেই যখন এই অমাবস্যা, তখন কোথায় আলো, কোথায় রঙ? অথচ কি আলোই না জ্বল্‌তে পারে জীবনের প্রদীপে রক্তের পল্‌তেতে, কি অফুরন্ত রঙ না ঝর্‌তে পারে পাঁজরের তলায় মনের ঝরণা থেকে! জীবনের অন্ধকার খোলা চোখে দেখার বীর্য ভাব-বিলাসী এস্‌থেটদের নেই। তাই এড়িয়ে যায় তারা এই অন্ধকারকে, বলে শাশ্বত

আলোর পূজারী তারা, ক্ষণিকের এই অন্ধকারের দিকে তারা চোখ দেবে কেন? জীবনের কেন্দ্রে অন্ধকারকে বাঁচিয়ে রেখে যারা আকাশের নীল আর মাঠের সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকে আর সকলের দৃষ্টি সেই দিকে টেনে নিয়ে চলে তারা শাশ্বত আলোর স্তবগান মুখে যতোই করুক না কেন, তারা আসলে আলোর পূজারী নয়, তারা অন্ধকার-রাক্ষসীর সেবায়েতের দল। মানুষের জীবন, তার প্রাণের আলো, রঙ সব এই রাক্ষসীর ভোগ দিয়ে আসচে তারা যুগযুগান্ত ধরে আর ভোলাচ্ছে মানুষকে প্রকৃতির রূপ দিয়ে। এই অন্ধকার-রাক্ষসীর থাবার তলায় মানুষের বুকের মধ্যে যে নীল যে সবুজ চাপা পড়ে আছে, গুমরে মরছে, তার তুলনায় আকাশের নীল আর মাঠের সবুজ কতোটুকু? আকাশের সব নীল, মাঠের সব সবুজ দেউলে হোয়ে যাবে মানুষের বুকের নীল-সবুজের সঙ্গে পাল্লা দিতে। মানুষের বুকের নীল আর সবুজ যতোদিন পাথর-রাক্ষসীর তলায় চাপা পড়ে থাকবে ততোদিন প্রকৃতির রঙ ও রূপের দিকে মানুষের মনকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে সর্বনাশী খেলা এস্‌থেটরা করে থাকেন সে খেলা অন্ধকার বজায় রাখবার খেলা। মানুষের বুকে বন্দী আলোর মুক্তির শত্রু হচ্ছে এস্‌থেটিক ভাব-বিলাসের এই খেলা।

জোড়াসাঁকো বাড়ীর এস্‌থেটিক দুর্গের রস-ঘন আবহাওয়ার বুক চিরে আমার মন তখন বিদ্রোহের পতাকা তুললো। বাড়ীর পূবের প্রাচীরে গায়েই সিংহীবাগানের বস্তি। বস্তিতে শত শত লোকের বাস। দক্ষিণের বারাণ্ডা আর ছাদ থেকে

যাত্রী

বস্তির মাটির বাড়ীগুলো চোখে পড়ে। বস্তির বাসিন্দা মেয়ে-পুরুষ-শিশুরা আমাদের বাড়ীর পাঁচিলের গায়ের সরু রাস্তা দিয়ে ঘোরাফেরা করে, রাস্তার ধারেই তারা বসে। বাতাস যেখানে পথ ভুলেও কখনো যায় না সেই অন্ধকার, স্যাত্স্যাতে কুঠরিগুলোতে তারা পিঁপড়ের সারির মতো গিয়ে ঢোকে যতটুকু আলোবাতাস পথের ধার থেকে কুড়িয়ে নিতে পারে তাই কুড়িয়ে বুকের মধ্যে পুরে নিয়ে। দিনের পর দিন বছরের পর বছর তাদের দেখেছি, তবুও জোড়াসাঁকো বাড়ীর এস্থেটিক-কুয়াসা ভেদ করে এই মানুষগুলো আমাদের কাছে মানুষ হিসেবে কখনো দেখা দেয় নি। তারা যেন আমাদের এই পৃথিবীর মানুষই নয়, তাদের সম্বন্ধে একটা কৌতূহল ছিলো হয়তো, কিন্তু সে কৌতূহল ছিলো এক অজানা জগতের অচেনা জীবদের সম্বন্ধে মানুষের যে কৌতূহল থাকে সেই কৌতূহল। তাদের সুখদুঃখ হাসিকান্নার সঙ্গে আমাদের বাড়ীর কোনো যোগ ছিল না। তারা আমাদের রস-সৃষ্টির, সাহিত্য-সৃষ্টির মালমশলা মাত্র, তারি যোগান দিতে পারাতেই তাদের জীবনের চরম সার্থকতা, তার বেশী তারা আর কিছু নয়। মানুষকে শুধু ভাব-রসের মালমশলার যোগানদার হিসেবে দেখাটাই হোলো এস্থেটিক দৃষ্টিভঙ্গীর মর্মকথা আর এই দৃষ্টিভঙ্গী হোলো কাপুরুষ স্বার্থপর লোভীর দৃষ্টিভঙ্গী। ভাব-রসের সামগ্রী কোরে মানুষকে কেমন করে পাঁকে নামিয়ে আনা যায় বৈষ্ণব রসবাদ তা প্রমাণ করেছে, আর শুধু ভাব-রস যোগাবার উপাদান, কলা-সৃষ্টির উপাদান হিসেবে গণ্য করে অত্যাচার উৎপীড়নের অন্ধকারের মধ্যে ডুবে-থাকা মানুষের দুঃখটাকে

কেমন করে এড়িয়ে যাওয়া যায় তার প্রমাণ দিয়েছে ভাব-বিলাসী এস্‌থেটরা। এস্‌থেটিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই আত্ম-কেন্দ্রিক ভোগলোলুপতা, ক্লীবত্ব ও নির্বীর্যতার বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহের ফণা তুলে গর্জে উঠলো। গান, কবিতা, রস-বিহ্বলতা সব অসহ্য বোধ হোলো। বাড়ীর ভাব-বিভোল আবহাওয়া যে শুধু অসহ্য মনে হোলো তা নয়, লজ্জা দিতে লাগলো আমাকে। রসের মক্ষিরানীকে কেন্দ্র কোরে মানুষের জীবনের মৌচাক তো এতকাল ধরে রচনা হোলো, গান, কবিতা, কলার মধু দিয়ে তো জীবনের মৌচাক ভরা হয়েছে যুগে যুগে, তাতে কি মানুষের উপর অত্যাচার, ভোগীর হিংসা, ধনীর হিংস্র পাশবিকতা গরীবের উপর বিন্দুমাত্র হ্রাস পেয়েছে? যারা এই ভাব-রসের সাধক তারা কি ভোগ-লোলুপতা, মানুষকে শোষণ করবার পশু-প্রবৃত্তি ও হিংসা ত্যাগ করেছে? আদবেই ত্যাগ করেনি, শুধু রসের তুলি দিয়ে রূপের আল্‌পনা এঁকে এরা নিজেদের জীবনের পাঁককে গোপন করেছে, ঠিক যেমন করে মুখের পাঁককে রুজ লিপ্‌স্টিক দিয়ে নিকিয়ে সহজাত কুরূপতাকে ঢাকা দেয় আধুনিকারা। উভয় ক্ষেত্রেই এটা ছলনা ছাড়া কিছু নয়। রস-সাধনার-সাধকদের সাধনার উদ্দেশ্য যে রসই, মানুষ নয় এটা আমি যেদিন উপলব্ধি করলুম সেদিন আমার মনের অশ্রান্ত প্রশ্নের জবাব পেলুম। নিজের ভিতর-বাইরে সবটাকে নতুন কোরে সাজাবার কাজে উঠে পড়ে লেগে গেলুম। মিহি চিকণ বেশ করলুম বদল। মোটা খদ্দরের ধুতি, খালি গায়ে খদ্দরের চাদর, এই হোলো আমার বেশ। পা দুটিকে জুতোর শৃঙ্খল থেকে দিলুম মুক্তি, ফিরতে

যাত্রী

লাগলুম খালি পায়ে কলকাতা সহরের ধুলো-সমুদ্র মন্থন করে। মুখের উপর বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিলুম দাড়ি গজিয়ে। বাড়ীতে বর্ষা-মঙ্গলের উৎসব, সুরের বিদ্যুৎ খেল্‌ছে বাড়ীর আকাশে, কলকাতার লোক ভেঙ্গে পড়েছে বর্ষা-মঙ্গলের উৎসব-সভায়, আমি বাড়ীতে থেকেও গেলুম না উৎসব-প্রাঙ্গনে। এই রকম কঠোরতার সঙ্গে সে দিন নিজের জীবনের ভিতর ও বাইরের আমূল পরিবর্তনের কাজে আমি লেগে গিয়েছিলুম। ত্রিশ বৎসর আগেকার আমার জীবনের রূপ এখনো আমার মনের আয়নায় মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। সেই অতীতের আমির দিকে তাকিয়ে দেখলেই ধরা পড়ে যায় সেই আমির ছেলেমানুষি আর বাড়াবাড়ি। সেই বাড়াবাড়ির মধ্যে ছেলে-মানুষি নিশ্চয়ই ছিলো, ফাঁকি কিন্তু আদবেই ছিলো না। মনের তাগিদে নি-খাদ আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেকে বদল করবার জন্যে মরিয়া হোয়ে উঠেছিলুম সেদিন। আর যাকে আমি বাড়াবাড়ি বল্‌ছি তার প্রয়োজনও ছিলো কেননা আমার মধ্যে এস্‌থেটিক-দুর্বলতা ছিলো যথেষ্ট। ভাব-রস পান করে মন ছিলো মাতাল, দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা দিয়ে এই ভাব-রস বয়ে যেতো দিনরাত অবিশ্রান্ত ধারায়। তখন আমি ছিলুম গান-বাঁশী-সাহিত্যের স্বপ্ন-পুরীর বাসিন্দে। পৃথিবীর মাটির সংগে আমার জীবনের কোনো যোগ ছিলো না সেদিন। কল্পনার আশমানে উড়ন্ত আমার জীবন-বিহঙ্গকে মাটির নীড়ে ফিরিয়ে আনবার জন্যে এমন একটি প্রবল টানের প্রয়োজন ছিলো যা কোন ওজর শুনবে না, যে আদর্শের মধ্যাকর্ষণে জীবন মাটির উপর এসে আছড়ে পড়ে সচেতন হোয়ে যাবে। ভাব-রসের

যাত্রী

আরকে-ভেজানো আমার অচেতন মনকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে জাগিয়ে তোলবার দরকার ছিলো। রস-আবিল আত্ম-কেন্দ্রিক স্বার্থপর মনকে ধীরে সুস্থে একটু একটু করে বদল করে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। আর কোনো গভীর পরিবর্তনই ঘটে না আস্তে আস্তে, ঘটে অকস্মাৎ, ঘটে নিমেষে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিধারা সঞ্চয় করে ঝরণা করে না বন্যার সৃষ্টি। বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় বিন্দু বিন্দু ব্যয়ে শেষ হোয়ে যায়। হঠাৎ আকাশ জুড়ে জোটে কষ্ঠি পাথরের মতো কালো মেঘের দল, নেমে আসে অশ্রান্ত বৃষ্টিধারা মেঘের কালো বুক থেকে, তবেই না ঝরণা-ধারা ঝরে পড়ে পাগ্‌লাঝোরা হোয়ে, তবেই না শেওলা যায় ভেসে, পাথর যায় সরে? সে কি ঝির্‌ঝির করে বয়ে-চলা ঝরণা ধারার কাজ? তার জন্যে চাই বন্যার কূল-ডোবান প্রবলতা। আমার বুকের ভিতর সেদিন বান এসেছে, পাঁজরের পাথর সরিয়ে দিয়ে বান ভরেছে আমার বুক কানায় কানায়। অন্তরে বন্যা অথচ বাইরে দেহের বালির চর ধূ ধূ করছে এও কি কখনো সম্ভব? যদি তাই হয় তাহোলে বুঝ্‌তে হবে বন্যা নেমে আসে নি বুকের ভিতর, শুধু ভুলিয়েছে আমাদের নকল বন্যার সর্বনাশী মরীচিকা। বান এলে ভিতর বাহির সব ডুবে যাবেই যাবে, একরঙা হবেই মন ও দেহ, এক সুরে বাজবেই দেহ-মনের একতারা। আমার বান-ডাকা মনেরই পরিচয় দিচ্ছিলো সেদিন আমার বাইরেটা। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পানাপুকুরে উঠ্‌লো সেদিন বিদ্রূপের ঢেউ আমাকে ঘিরে। সমাজের উপর-তলার বাসিন্দেরা আমার এই পরিবর্তন তাঁদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর উপর কটাক্ষ হিসেবে

ধরে দিলেন। রাগের ঝলক্ দিতো ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বাসিন্দেদের চোখে যখন আমি ধুলো-পায়ে খদ্দর গায়ে তাঁদের ড্রইংরুমের মজলিশে গিয়ে হাজির হতুম। এদের ক্রোধ আর বিদ্রূপের ধুলো আমার মনকে কিন্তু বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নি। এস্‌থেটিক দুর্বলতার ক্লেদ থেকে মুক্ত হোয়ে আমার মন তখন আনন্দে ভরপুর। উড়ছে মন পাখীর মতো মুক্তির আকাশে, ড্রইংরুমের ধুলো কি তাকে স্পর্শ করতে পারে? গান্ধীজির 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' তখন একেবারে টেনে নিয়েছে আমার মনকে। সেই প্রথম যুগের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় গান্ধীজি যেসব প্রবন্ধ লিখতেন তার কি তুলনা আছে? প্রত্যেকটি প্রবন্ধ যেন আগুনের ফুল্‌কি, যেখানে সেই ফুল্‌কি পড়ছে সেখানেই দুর্বলতা পুড়ে ছাই হোয়ে যাচ্ছে, অন্ধকার কেঁপে উঠ্‌ছে ভয়ে, মরে যাচ্ছে লজ্জায়। শোনালেন তিনি আমাদের সেই পাখীর কথা যার ডানায় নেই জোর। সূর্যের আলো, নীল আকাশের হাতছানি হার মেনে যায় তার কাছে। পাখীর জোটে না শস্য-কণা, কেমন করে সারা দেবে তার দুর্বল ডানা নীল আকাশের ডাকে? জীবনের চেয়ে গানকে বড়ো করবার এস্‌থেটিক ফাঁকি তার সমস্ত মিথ্যে সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে ধরা পড়ে গেলো। লক্ষ পাখীর দুর্বল ডানার অসহায় ক্রন্দন আমাদের শোনালেন গান্ধীজি, দেখালেন আমাদের ভারতবর্ষের সেই রিক্ত আকাশ যা লক্ষ লক্ষ পাখীর ডানার স্পর্শের জন্যে অধীর হোয়ে রয়েছে।

১৯১৯—১৯২০ সালে লেখা গান্ধীজির প্রবন্ধগুলি ছিলো অরণির মতো আগুন-ভরা, ধার্মিকতার পশ্‌লায় ভিজে প্রবন্ধ-গুলো তখনো ভিজে কাঠের মতো ধোঁয়াতে সুরু করেনি। তাঁর

লেখা প্রবন্ধগুলো বার বার পড়তুম। আলোচনা করতুম লেখাগুলো বন্ধুরা মিলে। চপলাকান্ত, অনাথ আর আমি আমরা তিনটি বন্ধু সেদিন পথে নেমে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। চপলাকান্ত আর অনাথ দুজনে ঘরে ফিরে গেছে, আমি পথেই রয়ে গেছি সে দিন থেকে।

১৯২১ সাল। গান্ধীজি বাঙলা দেশে এলেন বাঙলার জেলায় জেলায় সফর করবার উদ্দেশ্যে। ইয়োরোপ থেকে ফিরে আসবার পর রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের কয়েকটি বিশেষ দিকের সমালোচনা করেন। গান্ধীজিও তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার উত্তর দেন। অনেক দিন দুজনের দেখা হয় নি এবারে দুজনের দেখা হোলো। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেই সকাল বেলাটা। গান্ধীজি এলেন জোড়াসাঁকো বাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন পশ্চিম বারণ্ডায় সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যে বসবার ঘর তার পাশের ঘরে। সেই ঘরে ঢালা বিছানার উপর বসলেন গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ আর এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব। আমরা সবাই পশ্চিমের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গান্ধীজির আসার খবর ছড়িয়ে গেলো চার দিকে। গলি লোকে লোকারণ্য। বাড়ীর মধ্যেও অগুন্‌তি লোক পড়লো ঢুকে। বাড়ীর উঠোনে, বারাণ্ডায়, ছাদে দলে দলে লোক ভিড় করে দাঁড়ালো। বাড়ীর সামনের প্রাঙ্গনে বিলীতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব সুরু করলো গান্ধীজির হিন্দুস্থানী ভক্তের দল।

ঘরের মধ্যে শুধু তিন জন, গভীর আলোচনায় মগ্ন তাঁরা। বাইরে থেকে দেখছি—একবার রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তারপরে

গান্ধীজি, তারপরে আবার রবীন্দ্রনাথ। এণ্ড্রুজ সাহেব নির্বাক শ্রোতা। আমার ঠাকুরদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজ সাহেবকে 'হাইফেন' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে এণ্ড্রুজ সাহেব ছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীজির মধ্যের যোগসূত্র—হাইফেন। সে দিন সকালে এণ্ড্রুজ সাহেব ছিলেন এই দুই বিরাট পুরুষদের মধ্যে আত্মিক সেতুর প্রতীক স্বরূপ। পশ্চিমের বারাণ্ডায় বসে অবনীন্দ্রনাথ এই তিন জনের ছবি এঁকে নিলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত ছবি অনেকেই দেখে থাকবেন। পেন্‌সিল দিয়ে গান্ধীজির প্রতিকৃতি আঁকলেন আমার কাকী প্রতিমা দেবী। সেটি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। অনেক কাল সেই ছবিটি থাকতো আমার টেবিলের উপর। ইয়োরোপ চলে গেলুম, ফিরে এসে সে ছবি আর খুঁজে পাই নি। তিন ঘণ্টারও উপর আলোচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীজি। সন্ধ্যেবেলা রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে শুনলুম সকালের আলোচনার বিষয়গুলি।

চরকা চালাতে সুরু করলুম, লেগে গেলুম খদ্দরের কাপড় আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ফিরি করবার কাজে। বাড়ীর স্নিগ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে আমি নিয়ে এসে হাজির করলুম কালবোশেখীর ঝোড়ো হাওয়া। বড়োরা বিস্মিত হলেন ক্ষুব্ধও হোলেন, কিন্তু কখনো তাঁরা জোর করে আমাকে রুখ্‌তে চেষ্টা করেন নি। আমাদের বাড়ীতে চিন্তার স্বাধীনতার মর্যাদা ছিলো। বাড়ীতে একা আমি সক্রিয় ভাবে গান্ধীবাদের পক্ষে আর সবাই ছিলেন তার বিপক্ষে। আমার ঠাকুরদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ গান্ধীজির মহা-সমর্থক ছিলেন বটে কিন্তু একান্ত নিরাসক্ত সেই আত্মভোলা মানুষটি একেবারে সরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে সব কিছু থেকে।

জোড়াসাঁকো বাড়ীর হলেও তিনি যেন জোড়াসাঁকো বাড়ীর ছিলেন না।

আমার একরোখা অসহিষ্ণু মনের চেহারা তখন সজারুর মতো, কাঁটা বিঁধোবার জন্যে মন উঁচিয়ে ছিলো সব সময়েই। যাকে পাই তার সঙ্গে জুড়ে দিই তর্ক। মরছে মানুষ, জীবন-ভরা হাহাকার, বাঁচাও মানুষকে তার পরে গেও গান, বাজিও বাঁশী। ঘরে বাইরে করে চল্‌লুম তর্ক। আমার পিতা আমাকে অনেকবার বোঝাতে চেষ্টা করে হার মানলেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্ক সুরু হলো গান্ধীবাদ নিয়ে। দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠেই তাঁর যে বসবার ঘর ছিলো—যে ঘরে পরে তাঁর মৃত্যু হয় সেই ঘরে তিনি বসে ছিলেন, গল্প করছিলেন এক জনের সঙ্গে। আমি এসে উপস্থিত হলুম, কথায় কথায় কথা গেলো ঘুরে, গান্ধীবাদ নিয়ে আলোচনা হলো সুরু। ন্যাশানালিজম্, চরকা, যন্ত্রের বিরুদ্ধে গান্ধীজির অভিযান প্রভৃতি বহু বিষয় নিয়ে সে দিন সন্ধ্যেবেলা আলোচনা হলো প্রায় দু' ঘণ্টারও উপর। রবীন্দ্রনাথের একটি কথাও আমি মানিনি সেদিন। গান্ধীবাদের সমর্থনে তাঁর সঙ্গে তর্কই করে গেলুম সারা সন্ধ্যে। তখন গান্ধীজির লেখার ও বলার আয়নায় দেখছি ভারতবর্ষের এমন এক রূপ যা তা'র আগে কখনো দেখিনি, গান্ধীজির ডাকে শুনছি সেদিন লক্ষ লক্ষ লোকের চলার শব্দ, গণ-আন্দোলনের ধেয়ে-আসা বানের ক্রুদ্ধ গর্জন যার মত প্রবল সুর আমি আগে কখনো শুনি নি। তখন এই দেখা আর এই শোনা আমার মনকে এমন পরিপূর্ণ ভাবে দখল করেছিলো যে সেখানে ইন্‌টেলেক্‌চুয়ল্ সংশয়ের তিলমাত্র স্থান ছিলো না।

বুদ্ধি, বিচার সে দিন সব স্তব্ধ হোয়ে গিয়েছিলো লক্ষ লক্ষ লোকের চলার শব্দের অপূর্ব্ব ধ্বনির সামনে। সেদিন আমার মন বিচারশীল ছিলো না, বয়েস ছিলো কাঁচা আর রাজনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় তখন আমার ছিলোনা বল্‌লেই চলে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে তখন আমার মনটা ছিলো আবেগের বাষ্পে ভরা, জীবনের ইন্‌জিন্ চল্‌ছে তখন নিছক আবেগের ষ্টীমে।

পরে যখনই সেই সন্ধ্যেবেলার আলোচনা মনে পড়েছে তখনই রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি বেজেছে মনের কানে, অন্ধ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর জ্বলন্ত কথাগুলি আগুনের হল্‌কার মতো বুকে এসে বিঁধেছে। গান্ধীবাদের সমালোচনায় তিনি যা বলেছিলেন সেটাই ছিলো ঠিক। আবেগের কুয়াশায় আমার বুদ্ধি ছিলো আচ্ছন্ন, তাই তাঁর খাটি কথাগুলি থিতোতে পারে নি আমার হৃদয়ে, পিছ্‌লিয়ে পড়ে গিয়েছিলো কথাগুলি আবেগের কুয়াশা-পিছল আমার মনের উপর থেকে। তাঁর কথাগুলি যে সেদিন আমার মনে ধরে নি তার আরো একটি কারণ ছিলো। আমার দৃষ্টি-ভঙ্গীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি-ভঙ্গীর ছিলো মূলগত পার্থক্য। আমার মনের দৃষ্টি তখনও অস্থির, কেন্দ্রস্থ হয় নি মন, তবুও তার গতি তখনো ছিলো বিপ্লব-মুখী। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো নির্বস্তুক (abstract) মানব-প্রেমের সাধকের দৃষ্টি-ভঙ্গী। নির্বস্তুক মানব-প্রেম আর মানুষকে রস-সৃষ্টির উপাদান হিসেবে দেখার ভাববিলাস এই দু'টির সমর্থন ছিলো না আমার মনে, শুধু ছিলো মনে এদের সম্বন্ধে প্রবল অস্বীকার ও প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা। নির্বস্তুক মানব-ধর্মের সঙ্গে গান্ধীবাদের কি সম্বন্ধ তার বিচার

করছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর আমি দেখেছিলুম গান্ধীবাদকে গণ-আন্দোলনের স্রষ্টা হিসেবে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন খতম্ করবার যন্ত্র হিসেবে। এই দুটি ভিন্নমুখী মনের ধারার মধ্যে মিল সম্ভব ছিলো না।

জোড়াসাঁকো বাড়ীর ফটক পার হোয়ে আমার মন তখন সবেমাত্র যাত্রা সুরু করেছে, এমন সময় শুরু হোলো অসহযোগ আন্দোলন। কলকাতার ধূসর রাস্তা সেদিন হলো নদী। তার শান-বাঁধানো দুই তীরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চললো জনতার তপ্ত স্রোত। বিপ্লবের লাল জোয়ারে কানায় কানায় ভরে উঠলো রাস্তার নদী। সহরতলীর রাস্তায় রাস্তায় সে দিন কি স্রোত, কি আগুন-ভরা ঢেউ! সেই ঢেউয়ের গর্জনে শুধু এক ধ্বনি বেজে উঠ্‌লো—মহাত্মা গান্ধীকি জয়। সে দিন এই ডাক ছিলো মুক্তি-পিয়াসী জনতার ডাক। এই ডাকের অন্তরে ভরা ছিলো সে দিন কোটি কোটি লোকের স্বাধীনতা-তৃষ্ণা, নিপীড়ন, অত্যাচার, অনাহার থেকে মুক্তি পাবার আকুলতা, আশা, প্রতিজ্ঞা ও বিদ্রোহ। এই আগুন-ভরা ডাক সেদিন বিদেশী শাসকের বুকে জাগাচ্ছিলো ভয় আর আমাদের বুকে মুক্তি-স্বপ্ন, আলো, আশা আর সাহস। লোভী, ক্ষমতা-লিপ্সু, হিংস্র ও নীচ লোকদের মুখে, শেঠীর মুখে, ফড়েদের ও চোরাকারবারীদের মুখে এই ডাক আজ যেমন কলুষিত হয়েছে, অবমানিত হয়েছে, সেদিন তা' হয়নি। সেদিন পরাধীন ভারতের মুক্তির ডাক ছিলো—মহাত্মা গান্ধীকি জয়।

সে কি আশ্চর্য এক সময়, কি অপূর্ব প্রাণের আলোয় ভরা সেই দিনগুলি! সবাই সেদিন আপনার হোয়ে গেছে, প্রত্যেকটি ঘর আপনার ঘর মনে হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষের

কাছে দাবী জানাতে মনে এতোটুকু সঙ্কোচ নেই। কতো অজানা, অচেনা বাড়ীতে ঢুকে গিয়ে সেদিন খদ্দর বেচেছি, টাকা আদায় করেছি। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের মুখে স্বদেশী আমলে না কি এই রকম একটা প্রবল একাত্মবোধের জোয়ারে বাঙালীর মন ভরে উঠেছিলো কানায় কানায়। রাস্তার মু'টে মজুর, গাড়োয়ান থেকে শুরু করে ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, বাড়ীর মেয়েরা সবাই সেদিন অকাতরে দান করেছিলো স্বদেশী-ফাণ্ডে। স্বদেশীয় যুগ আমার সচেতন মনের পরিধির বাইরে। স্মৃতির আয়নার তার অস্পষ্ট রেখা ছবির মতো ভেসে ওঠে কখনো কখনো, কখনো বা ভুলে-যাওয়া গানের সুরের মতো বাজতে থাকে আমার মনে আমার ছোটো বেলার জীবনের সুরের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া স্বদেশী যুগের সুর।

অসহযোগ আন্দোলনই আমার জীবনে আন্‌লো এই রকম মন-প্রাণ-দখল-করা সর্বগ্রাসী অনুভূতির প্রথম অভিজ্ঞতা। স্বদেশী যুগে শুধু বাঙলা দেশের সীমানার মধ্যে যে বান ডেকেছিলো, এই প্রথমবারের মতো ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত সেই বে-হিসেবী বেপরোয়া আবেগের জোয়ার বয়ে গেলো। আমার কিশোর বয়সের সচেতন সত্তার কাছে অসহযোগ আন্দোলন এক আশ্চর্যরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিলো। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে বিদ্রোহের এই রকম দেশ-জোড়া জোয়ার আর এর আগে কখনো দেখা যায়নি। আমারই মত লক্ষ লক্ষ লোককে মুগ্ধ করেছিলো, টেনে নিয়েছিলো এই জোয়ার। মনের মধ্যে পরাধীনতার যে বেদনা ছিলো, স্বাধীনতার জন্য যে গভীর তৃষ্ণা ছিলো, সেই বেদনা ও তৃষ্ণা-মিশনো হৃদয়ের সুরের

সঙ্গে এই দেশ-জোড়া জোয়ারের সুরের ছিলো প্রাণের মিল। এই জোয়ারের উদ্দাম ব্যপকতা আমাকে মুগ্ধ করছিলো, এর গভীরতা বোঝাবার কিম্বা যাচাই করবার ক্ষমতা আমার ছিলো না সেদিন।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর জয় ধ্বনি উঠ্‌ছে রাস্তায় রাস্তায়। শত শত লোক এগিয়ে আস্‌ছে প্রতিদিন আইন ভঙ্গ করবার জন্যে। ইস্কুল কলেজ সব বন্ধ। রাস্তায় পুলিশ আর গোরা পল্টনের অত্যাচার চলছে পথিকদের উপর। রোজ প্রায় পাঁচশো লোক আইন-ভঙ্গ করে ধরা পড়ছে, আরো সহস্র এগিয়ে আস্‌ছে আইন ভাঙ্গবার জন্যে। সত্যিই সেদিন "আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান" এই ছিলো প্রতিটি কর্মীর মনের কথা। রাজনীতির ক্ষেত্রে পাটয়োরী বুদ্ধির লোকদের আবির্ভাব তখনো হয়নি ; দেশের দুর্গতিতে কর্মীদের বুকের প্রতিটি শিরা ব্যাথায় টন্‌ টন্‌ করছিলো, দেশের প্রতি ভালোবাসায় তাদের মন ছিলো কূলে কূলে ভরা। তাই দেশের জন্য দুঃখ ভোগ, অসীম নির্যাতন সওয়া অত্যন্ত সহজ কর্তব্য হিসেবে দেখা দিয়েছিলো সে সময় কর্মীদের কাছে। দেশ-সেবা তখনো ত্যাগ এই নাম নেয় নি আর এই ঝুটো নাম নিয়ে মালা চন্দন পূজোর কোনো দাবী করে নি। মত্‌লবী লোকদের কাছে দেশের জন্যে অতি সামান্য দুঃখভোগও 'ত্যাগ' বলে মনে হয়, ত্যাগের ছদ্মবেশে সাজায় তারা নিজেদের স্বার্থ-সেবার কষ্ট-ভোগকে। ভালোবাসা নিজের গরজে বরণ করে দুঃখ, যাকে ভালোবাসে তার কাছে একান্ত আত্ম-নিবেদনের আনন্দে সে ভরপুর ; কিছুর অভাবই সে বোধ করে না। ত্যাগের নামাবলা গায়ে দিয়ে লোক ঠকাতে তার রুচিতে বাধে। সেদিন

যাত্রী

দেশকে ভালোবাসে এমন শত সহস্র লোক এসেছিলো এগিয়ে, তাই তাদের ভালোবাসার সহজ ও নীরব আত্ম-নিবেদনের সৌরভে দেশ মাতোয়ারা হোয়ে উঠেছিলো। 'ত্যাগীদের' আত্ম-প্রচারের কোলাহল সেদিন আদবেই ছিলো না। সহজ হবার, নির্ভীক হবার, বিলাস ত্যাগ করবার গভীর আবেদন ছিলো অসহযোগ আন্দোলনের ডাকের মধ্যে। সমাজের উপরতলার ভোগ-পঙ্কিল আবহাওয়ার জীবন এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো যে সহজ হবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো জীবন। সহজ হোলে লোকে কি বলবে এই আশঙ্কায় ও সঙ্কোচে জীবন ছিলো ভরা। গান্ধীজি ত্রাণ করলেন আমাদের এই সঙ্কোচের গ্লানি থেকে। মন ও দেহকে, নিরাভরণ সহজ অথচ প্রবল এক সুরে বেঁধে নিয়ে গভীর আনন্দে মন গেলো ভরে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূবদিকে একটি বাড়ীতে তখন কংগ্রেসের আপিস। অসহযোগ আন্দোলনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা ও সহরের স্থানে স্থানে আইন অমান্যের জন্য স্বেচ্ছা-সেবক পাঠানো হোতো এই কেন্দ্র থেকে। আন্দোলন তখন সবেমাত্র কয়েকদিন শুরু হয়েছে এমন সময় একদিন বিকেলে এই কেন্দ্রে উপস্থিত হোয়ে আমার নাম দিলুম আইন-অমান্যের স্বেচ্ছাসেবকের তালিকায়। স্থির হলো তার পর দিন বিকেলে আইন-অমান্যকারীদের সঙ্গে আমি বের হবো। শরীর মন আলোর মত হাল্‌কা বোধ হতে লাগলো সংকল্পের আনন্দে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে হন্ হন্ করে বাড়ী ফিরছি। মাটিতে যেন পা পড়ছে না, আবেগের ঝোড়ো হাওয়া আমাকে যেন ঠেলে নিয়ে চলেছে। রাত্তিরে আমার পিতা যখন বাড়ী ফিরে এলেন

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখন তাঁকে জানালুম আমার সংকল্পের কথা। তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। কৌচের উপর চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ। রাত্তিরের খাবার এলো, নাড়াচাড়া কোরেই তিনি উঠে পড়লেন, খাওয়া আর হোলো না। গভীর রাত্রে এলেন তিনি আমার শোবার ঘরে, আমার বিছানায় বসে বার বার আমাকে অনুরোধ করলেন আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান না করতে। সমবেদনা-লুব্ধ লোকদের মত দুঃখ জাহির করার কুরুচি আমার পিতার কিছুমাত্র ছিলো না। যতো দুঃখ তিনি পেয়েছিলেন জীবনে, সব তিনি অন্তরের গভীর গহনে নিয়ে গিয়েছিলেন লোকচক্ষুর আড়ালে, নিবেদন করেছিলেন তাঁর সব দুঃখ শুধু তাঁর অন্তরদেবতাকে। বেদনার মাধুর্যে মধুর ছিলো তাঁর স্নিগ্ধ হাসি আর প্রশান্ত দৃষ্টি। বেদনা যদি না চোখের উপর থেকে ধূলোর পর্দা সরিয়ে দেয়, মুখের মাটি ধুয়ে না দেয়, তাহোলে হাসিতে দৃষ্টিতে এই অপরূপ স্নিগ্ধতা ও শুভ্র প্রশান্তি কখনো ফুটে ওঠে না। ক্লান্ত স্নেহ-বেদনায় কাতর তাঁর সেই কণ্ঠস্বর আজো আমার কানে বাজে। সে রাত্তিরে তাঁর অনুরোধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলুম বারবার, শেষে হার মানলুম তাঁর ক্লান্ত স্নেহ-বেদনার কাছে। হোলনা আমার আইন অমান্য করা, হোলনা আমার আন্দোলনের ফুটন্ত ঢেউয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। বুকের মধ্যে পাগল-করা ঢেউয়ের মাতামাতি চেপে রেখে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি তীরে।

কলকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয় লালা লজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে, সেই অধিবেশনেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই কংগ্রেসে গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। মনে পড়ে দেশবন্ধুর বক্তৃতা। আইনজ্ঞের

বাক্‌চাতুরী যথেষ্ট ছিল সে বক্তৃতায়। সে বিরুদ্ধতা কিন্তু ঝড়ের মুখে পালকের মতো উড়ে চলে গেলো। আমার মন আদবেই স্পর্শ করেনি সে বক্তৃতা। গণ-আন্দোলনের ঝড়ের মধ্যে, কূল-ডোবানো বানের মধ্যে কৌশলের, চাতুরীর, কূটনীতির ছক কাটার স্থান কোথায়? সহজে হার মানবার লোক ছিলেন না দেশবন্ধু। নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করবার জন্য বাঙলা দেশ থেকে ট্রেন বোঝাই লোক নিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ নাগপুরে যান। সেই একই ট্রেনে আমি, নলিনাক্ষ ও আরো কয়েকজন যাই নাগপুরে নিখিল-ভারত-ছাত্র-কন্‌ফারেন্সে যোগ দেবার জন্যে। সারা পথ মনে হচ্ছিল যেন বর-যাত্রীদের সঙ্গে চলেছি। হাসি, গল্প আর যে অফুরন্ত আকণ্ঠ ভোজন চলছিলো সারা পথ তাতে দেশ ঠাঁই পাবে কোথা এদের বুকের মধ্যে! নাগপুরে চিত্তরঞ্জন আত্মসমর্পণ করলেন গান্ধীজির কাছে। ফিরে এলেন বাঙলাদেশে সম্পূর্ণ নতুন মানুষের রূপে। ব্যারিষ্টারি ছেড়ে দিলেন, বিলাস করলেন বর্জন, গায়ে বালাপোশ, পরনে খদ্দরের ধুতি, পায়ে চটি এই বেশে আমরা তাঁকে দেখলুম। তাঁর এই পরিবর্তন বাঙালীর ভাবপ্রবণ হৃদয়কে উদ্বেল করলো। বাঙালী তাঁকে দেশবন্ধু হিসেবে বরণ করে নিলো হৃদয়ের মধ্যে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্বেই তিনি চলে গেলেন জেলে। একটি সন্ধ্যের ছবি আমার মনে জ্বল্‌জ্বলে হোয়ে আছে। 'সারভেন্ট' পত্রিকার আফিসে গিয়েছি সন্ধ্যের পরে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মশায় রয়েছেন। ঘর ভর্তি লোক। দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের খবর এলো। দেশবন্ধুর পরে তাঁকে আন্দোলনের নায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে এই শুনে ভাব-প্রবণ শ্যামসুন্দর অশ্রুবর্ষণ করতে

লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনিও বন্দী হোলেন। গ্রেপ্তারের মরশুম চলেছে তখন, হাজার হাজার লোকে বাঙলার কারাগারগুলি ভর্তি। এক বাঙলাদেশেই বিশ হাজারের উপর লোক আইন অমান্য কোরে জেলে গেলো। আন্দোলনের এই জোয়ারের মুখেই একদিন খবর এলো যে পুলিসের অত্যাচারে ক্ষেপে গিয়ে চৌরিচৌরার জনতা কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করেছে আর এই কারণে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করে দিয়েছেন। সমস্ত দেশ স্তম্ভিত হোলো বটে আন্দোলন স্থগিতের খবরে, তবু মেনে নিলো গান্ধীজির আদেশ। অহিংসার মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে আন্দোলন বন্ধ করা হোলো, গান্ধীজি দিলেন এই যুক্তি। এই যুক্তি খণ্ডন করবার প্রতি-যুক্তি সেদিন আমার ছিলোনা। তবুও মন আমার গভীর ভাবে ব্যথিত হোলো আন্দোলন বন্ধ হোয়ে যাওয়াতে, কি রকম যেন মনের ভিতরে সব এলোমেলো হোয়ে গেলো। মনের মধ্যে ভারী অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম, কোথায় যেন কি একটা গলদ আছে এইটে মনে হোতো লাগলো, অথচ গলদ ধরবার মত রাজনীতির জ্ঞান ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা তখন আমার আদবেই ছিলোনা। এর অল্পদিন পরে গান্ধীজি দীর্ঘ কালের মত কারারুদ্ধ হোলেন। চর্‌খা, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-সাধন প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে পূর্বের চেয়ে আরো বেশী কোরে আমাদের লেগে পড়তে হুকুম দিয়ে গান্ধীজি চলে গেলেন। হঠাৎ যেন সব স্তব্ধ হোয়ে গেলো। ঝড়ের অট্টহাসি, ঢেউয়ের গর্জন সব থেমে গেলো। হাজার হাজার লোকের মুখে যে আলো ফুটে উঠেছিলো, নিবে গেলো সে আলো। পথ আর নদী রইলো না,

হোলো আবার সেই আগেকার পাথর। আলো নিব্‌লো, ঢেউ সরে গেলো, ঝড় লুকোলো দিগন্তের অঞ্চল-তলে, নদী গেলো শুকিয়ে। সে এক ভয়ঙ্কর মরা দিন আমাদের সামনে হাজির হোলো। নিজের জোরে পথ কেটে চল্‌বার মতো কোনো শক্তি তখন ছিলো না আমার। আমার জন্যে গান্ধীজির লেখাগুলিই ছিলো পথ। সেই পথ দিয়ে আমি চলেছিলুম নিঃসংশয়ে। সে পথও বন্ধ হোয়ে গেলো গান্ধীজি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কে যেন আলো থেকে একেবারে অন্ধকারে ঠেলে দিলো আমাকে। শুধু একটি পথ সামনে ছিলো। গঠন-মূলক কাজে আত্মনিবেদন কোরতে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন গান্ধীজি। গান্ধীজির আদেশ মেনে গঠন-মূলক কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াই ছিলো আমার ও আমার মতো শত শত তরুণের পক্ষে নিরাশার দম-বন্ধ-করা অন্ধকার থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ। মনে গুমোট, বাইরে গুমোট, সে অসহ্য অবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্যে' কলকাতা ছেড়ে কোথাও গ্রামে চলে যাবো স্থির করলুম। এমন সময় হঠাৎ একদিন চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হোয়ে গেলো, তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন বোনপাশে যেতে। বেঁচে গেলুম আমি, তখনই স্থির করলুম বোনপাশ যাবো। চপলা চলে গেলো কুমিল্লায় 'অভয় আশ্রমে', অনাথ গেলো বীরভূমের একটি গ্রামে, আমি চলে গেলুম বোনপাশে। একটি নদী যেন অনেক ধারায় নিজেকে ভাগ করে দেশের চারদিকে ছড়িয়ে গেলো।

বোনপাশ। গ্রামের বাইরে ধূ ধূ করছে মাঠ। কঙ্কালের মতো হাড়-বের-করা শুক্‌নো ডাঙ্গা। সেই ডাঙ্গার এক প্রান্তে

যাত্রী

আমার কুঁড়ে ঘর। একটি ঘরে আলু রাখা আছে বোঝাই করে। অন্য ঘরটিতে থাকি আমি। কিছু দূরে সরু মরা নদী, চোখের জলের মতোই স্বল্প তার জল। ঘরের পেছন দিকে কয়েক পা গেলেই সাঁওতাল গ্রাম। সন্ধ্যেবেলা মহুয়ার গন্ধের সঙ্গে ভেসে আসে সাঁওতাল গ্রামের মাদলের আওয়াজ। ঘর থেকে দেখতে পাই সাম্‌নের মাঠ দৌড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে তকীপুর গ্রামের সীমানায়। বেলা বাড়্‌তেই মাঠ ওঠে তেতে, নিঝুম মাঠের সুর কানে আসে, যেন রোদের ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাক্‌ছে। খালি মাথায়, খালি পায়ে মাঠ পার হোয়ে যাই তকীপুর গ্রামে। গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে আলাপ করি, চর্‌খার কথা বলি, মহাত্মাজীর আদেশ শোনাই তাদের, বলি তাদের আন্দোলনের কথা, আবার মাঠ পার হোয়ে ফিরে আসি আমার ঘরে। একবেলা রাঁধি, খাই দুবেলা। কোনো কোনো দিন মুড়ি চিড়ে খেয়েই কাটিয়ে দিই। সাঁওতাল গ্রামের সঙ্গেও আত্মীয়তা বাড়্‌তে লাগলো। ছেলেমেয়েগুলো ঘরের বাইরে ঘোরাঘুরি কর্‌তো, আস্তে আস্তে ঘেঁসে এলো দাওয়ার কাছে। তারাই হোলো আমার সেতু সাঁওতাল গ্রামের অন্তরে পৌঁছে যাবার। তকীপুর গ্রামটি আয়তনে বড়ো, মজে-যাওয়া বড়ো বড়ো দীঘি অতীতের ভালো সময়ের সাক্ষী দেবার জন্য কোনো মতে বেঁচে আছে।

এতো বড়ো গ্রামে লোক খুবই অল্প, ম্যালেরিয়ার দাপটে গ্রাম উজাড়। যে পেরেছে সেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে, যারা রয়েছে গ্রামের বাইরে ডাঙার মতোই তারা হাড়গোড়-বের-করা কঙ্কালসার। গ্রামের মধ্যে ঢুক্‌লেই মনে হয় যেন, গ্রাম তার মরা হাতটি বুকের ওপর চেপে ধর্‌ছে। জীবন্ত, তাজা

কোনো কিছু তার চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকবে এতে তার ঘোর আপত্তি। গাঁয়ের পথে লোক চলে কালো ছায়ার মতো, কোনো-মতে কাজ সেরে ঘরে ঢুকতে পারলেই তারা বাঁচে। উদ্বৃত্ত তো কিছু নেইই, প্রাণ এদের তলানীরও তলানীতে পৌঁছে গেছে। এমন অসহ্য মরা চেহারা আমি এর আগে আর কখনো দেখিনি। ক্লান্তির অবসাদে ঝিমোনো এই গ্রামে আমার কাজ সুরু করলুম। চর্‌খা চালাতে, কুঁড়ের গায়ের জমিতে তুলোর চাষ করতে উৎসাহিত করতে লাগলুম গাঁয়ের লোকদের। গ্রামের পথঘাট পরিষ্কার করবার কথাও তুল্‌লুম এদের কাছে। উত্তরে শুধু বোবা অসহায়তা ভেসে ওঠে এদের চোখের দৃষ্টিতে, কোনো কিছু করবার মতো শক্তি এরা নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছে। মন! আত্মা! মনের অপরাজেয় শক্তি! আত্মার প্রাধান্য! ঝুটো কথার কতো না সওদা ফিরি করে ফেরে বাবুরা জীবনের রাজপথে ভরা পেটের খুস্‌ মেজাজে। শরীর শুকিয়ে গেলে 'আত্মা' যে কেমনতর শুকিয়ে যায়, মন যে কেমন হোয়ে যায় মরীচিকার মরীচিকা, তা' একবার ড্রইংরুম থেকে নেমে এসে যদি বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস 'আধ্যাত্মিক' বাবুদের একটুও থাক্‌তো তাহোলে হয়ত তারা বুঝতে পারতো। তকী-পুরের গায়েই বিল্বগ্রাম। সেখানেও যাতায়াত সুরু করলুম। আজো ভুলিনি গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোক লম্বোদর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে নেমন্তন্নের কথা। নেমন্তন্ন কোরে বাড়ী নিয়ে গিয়ে তিনি শোনালেন আমাকে যে আর যাই হোক্‌ না কেন এ গ্রামে ব্রাহ্মণের অপমান কখনো হয়নি, আর সেইটি হাতে হাতে প্রমাণ কোরে দেবার জন্যেই বোধ হয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেখানে খেতে

বসলেন সেই ঘরের চৌকাঠের ওদিকে আমাকে খেতে বসালেন! গাঁয়ের জীবনের সঙ্গে আমার সেই প্রথম সত্যিকার পরিচয়। গাঁয়ের জীবন নিয়ে অনেক কবি অনেক কবিতা লিখেছেন, পল্লী-জীবনের কতো মধুর ছবিই না তাঁরা এঁকেছেন! কোয়েল-দোয়েল-ডাকা গ্রামের বনতলের ছবি, দীঘির কাক-চক্ষু জলে কলস ভর্‌তে চলেছে গ্রামের বধূ, সরলতা ও মানবতায় ভরা গ্রামবাসীদের জীবন? হায়রে, এর যদি এক্‌টাও সত্যি হোতো, বাস্তবের সঙ্গে যদি এর কোথাও লেশমাত্র সম্পর্ক থাকতো! এই গ্রাম ও এই গ্রামবাসী দুইই কবির কল্পনা-লোকের বাসিন্দে, আমাদের এই মাটীর বাসা পৃথিবীতে কোথাও তাদের অস্তিত্ব নেই। কোয়েল-দোয়েল হয়তো কখনো কখনো পথ ভুলে ডেকে চলে যায় গাঁয়ের বনে, যা অহরহ ডাকে সে হচ্ছে মশা। মশা-ডাকা গ্রামের সন্ধ্যেগুলি যে কি ভয়াবহ তা' ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। শ্যাওলা-ঢাকা মজে-যাওয়া দীঘিগুলো ছানি-পড়া আধ্‌বোজা চোখের মতো বিশ্রী। জল তার বিষাক্ত। গাঁয়ের মেয়ে আধ-পেট খেয়ে জন্তুর মতো খেটে চলে সকাল হ'তে সন্ধ্যে। তার কাঁকের কলসী যদি কথা বল্‌তে পারতো তাহোলে কবির বর্ণনা লজ্জায় মুখ ঢাকতো। গাঁয়ের জীবন নীচতা, কুটিলতা, পরশ্রী-কাতরতা, দলাদলি আর কুসংস্কারে ভরা। গাঁয়ের জীবনের মাধ্যাকর্ষণে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়েছে, নেমে গেছে মানুষ জন্তুর পর্যায়, প্রকৃতি-রাক্ষসীর জৈবিক এলাকায় হাত-পা-বাঁধা বন্দীর মতো পড়ে থেকেছে মানুষ যুগের পর যুগ। শহর ও শহরের জীবন বল্‌তে সত্যি যা বোঝায় এরাই মানুষকে পথ দেখিয়েছে মুক্তির দিকে। আমাকে গ্রামের জীবন কখনো মুগ্ধ করে নি,

সে দিনও না আজও না। পরে যখন গ্রামের জীবনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে তখন পল্লী-জীবনের উপর আমার বিতৃষ্ণা কমে তো নি-ই বরঞ্চ অনেকগুণ বেড়ে গেছে।

সন্ধ্যে হবার আগেই মাঠ পার হোয়ে চলে আসি আমার কুঁড়েতে, যাই সাঁওতাল গ্রামে। ছোট্ট গ্রামখানি, তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। নিকোনো আঙিনা, ঘর দোর কি পরিস্কার! সবলদেহ মেয়ে পুরুষ। দুজনেরই শরীর যেন ঢালাই-করা ইস্পাতের ফোয়ারা। মেয়েদের পরণে মোটা লাল পেড়ে শাড়ী হাঁটু পর্যন্ত, গলায় কুঁচের মালা। চুলে পরে তা'রা জবা ফুল। মনে হয় যেন কালো ইস্পাতের ডগায় কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যে বেলায় আকাশ-ছোঁওয়া বট-গাছের তলায় বসে সাঁওতালদের সঙ্গে গল্প করি। মহুয়ার ঝাঁঝালো গন্ধে মাথা ধরে আসে। মাদল বাজে; ছোটো ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে বেড়ায়। একবার জোর পরীক্ষা করলুম সাঁওতাল ছেলের সঙ্গে। গ্রামের লোক মেয়ে পুরুষ সব জুটলো বিকেল বেলা, মাদল বাজলো, আমরা দুজনে একটা রসি দুদিকে ধরে দাঁড়ালুম। কে কাকে টেনে নিতে পারে এই হোলো বাজি। জিতলুম আমি, শরীরে ছিলো তখন দরকারের চেয়েও বেশী শক্তি। গাঁয়ে বিয়ের ধূম লাগলো, লাল পেড়ে শাড়ী আর হাড়িয়ার খরচা যোগালুম আমি। এমনি কোরে তা'রা আমাকে আপনার কোরে নিলো, আমি নিলুম তাদের আপনার কোরে। সকাল সন্ধ্যা আমার ঘরে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের ঘোরাফেরা আসা যাওয়ার স্রোত বয়। এমনি কোরেই কাটছে দিন, একদিন গ্রামে থেকে

ফিরে এলুম, শরীরটা জ্বর জ্বর বোধ হতে লাগলো, শুয়ে পরলুম মাহুরে, তুদিন পড়ে রইলুম জ্বরের ঘোরে অসহ্য মাথার যন্ত্রণায়। গাঁয়ের লোকেরা এলো খবর পেয়ে, গরুর গাড়ীতে পৌঁছে দিলো ষ্টেশনে, তুলে দিলো বোলপুরের গাড়ীতে। দাদামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও আমার বড়োমা হেমলতা দেবী থাকতেন তখন নীচু বাংলায়। কোনো রকমে এসে হাজির হলুম বড়োমার কাছে। কয়েকদিন বাদে জ্বর ছাড়তে কলকাতায় চলে গেলুম। ম্যালেরিয়া জ্বরের জের চললো অনেক মাস ধরে। বোনপাশের পাট উঠলো, সেখানে আর ফিরে যাওয়া হোলনা। কলকাতায় ফিরে এলুম অসাড় শরীর ও মন নিয়ে। চুপচাপ পড়ে থাকি ঘরে, যখন মন চায় গান গাই, যখন ভালো লাগে পড়ি। জীবনটা যেন একটা ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেছে, কিছুতেই আর এগোতে পারছেনা। চুপ করে যাওয়াটা তখন নিজেকে বাঁচাবার একমাত্র পথ ছিলো, নইলে ঘূর্ণির তলায় তলিয়ে যেতুম একেবারে। বাইরের অবস্থাও তখন আমারই মতো, সারা দেশ তখন এক ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী ঘূর্ণিতে আটকে গেছে, কিছুতেই জোর পাচ্ছেনা ঘূর্ণি থেকে বের হোয়ে যাবার। ধর পাকড় তখনো থামেনি, কেউটের মতো ছোবল্ মেরেই চলেছে বৃটিশ শাসকেরা।

১৯২৩ সাল। বন্যায় ভেসে গেলো উত্তর বঙ্গ। শত শত গ্রাম ডুবে গেলো বন্যার জলে, হাহাকার উঠ্‌লো বাঙ্গলা জুড়ে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বন্যাপীড়িতদের ত্রাণের জন্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের আহ্বান দিলেন। আমি আর আমার পিসে-মশায় নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমরা তুজনে গেলুম

আত্রাইতে। সেখান থেকে গেলুম আমরা কালিগ্রাম পরগণায়। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরতে লাগলুম। চারদিকে অথৈ জল, ক্ষেত, মাঠ, গ্রাম সব এক হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে উঁচু জমিগুলো কচ্ছপের পিঠের মতো জলের ভিতর থেকে মাথা তুলে আছে। ডিঙ্গি ঠেলে গ্রামে গিয়ে উঠি। জলে জেঁাক আর সাপ, জলে নেমে ডিঙ্গি ঠেলবার সময় সাপ লাগে গায়ে। ডাঙ্গা জমির উপর গাছের গুঁড়িতে অগুন্‌তি সাপ জড়িয়ে। মরা গরু বাছুর ভেসে চলেছে। গ্রামে গ্রামে সুরু হয়েছে মড়ক। গ্রামে গ্রামে ওষুধ দিই, শোধন করি কুঁয়োর জল, কাপড় বিলোই, টাকাও দিয়ে আসি কোনো কোনো গ্রামে। এই রকম করে এক মাস গ্রামে গ্রামে ঘুরে ফিরে এলুম কলকাতায়।

জেল থেকে বের হোয়ে আসবার পরেই দেশবন্ধু এক নতুন কর্মপদ্ধতি হাজির করলেন দেশের সামনে। বাইরে থেকে আঘাত কোরে বিদেশী শাসনযন্ত্র ভেঙে দেওয়া গেলো না, এবারে ওদেরি তৈরী আইন-সভায় ঢুকে শাসনযন্ত্রকে অচল কোরে দিতে হবে। গান্ধিজীর আইন-সভা বর্জনের নীতি পাল্‌টাতে হবে; এও অসহযোগ, তবে এ অসহযোগ আইন সভায় ঢুকে করতে হবে। আইনসভা থেকে সরে গিয়ে বৃটিশের পদলেহী ভারতবর্ষীয়দের দেশের নামে দেশের সর্বনাশ করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই দেশদ্রোহীদের তাড়াতে হবে। দেশের নামে সাম্রাজ্যবাদের সেবা করবার সব সুযোগ থেকে এদের বঞ্চিত করতে হবে। এই ছিলো দেশবন্ধুর নতুন কর্মপদ্ধতির উদ্দেশ্য আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি স্বরাজ পার্টি গঠন

করেন। গান্ধিজী এই নতুন কর্মপদ্ধতি মানতে পারলেন না, বাধাও কিন্তু তিনি দিলেন না দেশবন্ধুকে এই নতুন কর্মপদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে। স্বরাজ পার্টির পত্তন হোলো। মতিলাল নেহরু, জিন্না, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রভৃতি নেতার দল যোগ দিলেন। ইলেক্‌সনের ধূম পড়ে গেলো দেশে। বৃটিশের জো-হুকুমের দল কোথায় গেলো ভেসে স্রোতের মুখে কচুরী-পানার মতো। স্বরাজ পার্টির লোকে আইন সভা গেলো ভরে। শাসন-যন্ত্র অচল কোরে দেবার জন্যে দেশবন্ধু মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব আনলেন। টাউন হলের দোতলায় তখন কাউন্সিলের অধিবেশন হোতো। দেশবন্ধু অসুস্থ ছিলেন, ট্রেচারে শুইয়ে তাঁকে দোতলায় তোলা হোলো। নীচে লোকের ভিড়। উপরে গ্যালারীতে আমরা ভিড় কোরে বসে আছি। সভাগৃহে উত্তেজনার ঢেউ বইছে, আসা-যাওয়ার অন্ত নেই। সভার আরম্ভে বাঙলার গভর্ণর লর্ড লিটন এসে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব যেন না আনা হয় এই অনুরোধ জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন। লর্ড লিটন বক্তৃতা দিয়ে যেতে না যেতেই দেশবন্ধু আনলেন অনাস্থা-প্রস্তাব। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হোল। আমরা জয়ধ্বনি তুল্‌লুম দর্শকের গ্যালারী থেকে, নীচে জয়ধ্বনি তুল্‌লো অপেক্ষায়মান জনতা। কটন সাহেবের আদেশে আমাদের বের করে দেওয়া হোল গ্যালারি থেকে। লর্ড লিটন আবার কয়েকটি জো-হুকুম জুটিয়ে মন্ত্রী বানালেন। আবার তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এলো, পাশও হোলো। এই রকম কোরে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বার বার তিনবার অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করালেন দেশবন্ধু।

জো-হুকুম গোলামের দল মন্ত্রী হোতে পারলো না বটে কিন্তু শাসন-যন্ত্র একটুও অচল হোল না। ব্রিটিশ গভর্ণর তাঁর পরামর্শদাতাদের সাহায্যে তোফা আরামে শাসন করতে লাগলেন। বদেশী শোষকদের শাসন-যন্ত্রে কোথাও বিন্দুমাত্র চিড় ধরার লক্ষণ দেখা গেলো না। আইন সভায় বক্তৃতা দিয়ে ভোট দিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ কোরে কি অত্যাচারী শাসকদের হটানো যায়; ক্ষমতা দখল করা যায়?

স্বরাজ পার্টি সম্বন্ধে প্রথম থেকেই আমার মনে সন্দেহ ছিলো, বিরূপতাও ছিলো। আইন সভার মধ্যে ঢুকে যে গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধতা করবার দরকার আছে আর বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থাতে সেটা যে অত্যন্ত জরুরী কাজ এ জ্ঞান তখন আমার ছিলোনা। গান্ধিজী এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে রাজী হননি, এই ছিলো আমার কাছে সবচেয়ে দামী যুক্তি। তাছাড়া স্বরাজ পার্টি সম্বন্ধে আমার সাহজিক (instinctive) বিরূপতা ছিলো খুব জোরালো। যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু মন বলছিলো এ পথে হবে না। কাউন্সিলে বক্তৃতা দিয়ে দেশ স্বাধীন করা যায় না। রাস্তাটাকে করতে হয় বিপ্লবের নদী আর তাতে ডেকে আনতে হয় জোয়ার গণ-সমুদ্র থেকে তবে দেশ স্বাধীন হয়, আর সে পথ আমাদের দেখিয়েছেন গান্ধিজী, দেশবন্ধু নয়। এর দু' এক বছর পরে গণবাণীতে একটি প্রবন্ধে স্বরাজ পার্টিকে আমি উকীল-ব্যারিষ্টার-জমিদার বাবুদের দল বলে অভিহিত করি। আমার সহজ-বুদ্ধির (instinct) যে সন্দেহ ছিলো তা'র যথার্থতার যাচাই হোয়ে গেলো পরবর্তী কালে যখন আমি রাজনৈতিক বিশ্লেষনের

ক্ষমতা লাভ করলুম। তখন বুঝলুম স্বরাজ পার্টি শুধু কাউন্সিল ঘরে হাত ছুঁড়ে বক্তৃতা দেবার কর্মপদ্ধতি নিয়েছে। বুঝলুম স্বরাজ পার্টির নেতাদের মধ্যে একজনও গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করবার ক্ষমতা রাখেন না। বাইরের গণ-আন্দোলনের সম্পূরক হিসেবে আইন সভায় গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধতা করার কর্ম-পদ্ধতি স্বরাজ পার্টির নেতারা গ্রহণ করেন নি। তাঁরা রাস্তা থেকে একেবারে সরে পড়ে সাত তাড়াতাড়ি ঢুকে বসেছিলেন কাউন্সিলের ঘরে। রাস্তা থেকে সরে পড়ার যে রূপ স্বরাজ পার্টির প্রত্যেকটি নেতার চেহারায়, বক্তৃতায়, ও কর্মে ফুটে উঠেছিলো তারি বিরুদ্ধে আমার মনে সাহজিক সন্দেহ ও বিরূপতা দেখা দিয়েছিলো। গণ-আন্দোলনের বৈপ্লবিক পন্থা ছেড়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বাঁধা সড়কে দেশকে হাঁটি হাঁটি পা পা করাবার মতলব নিয়ে তৈরী হোলো স্বরাজ পার্টি। নিয়মতান্ত্রিক প্রণালীতে আন্দোলন কোরে দেশ স্বাধীন কোরতে হবে, প্রস্তাব পাশ কোরে বৃটিশ পার্লামেণ্টে পাঠিয়ে দিয়ে শাসকদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত কোরে দেশ স্বাধীন করতে হবে, কংগ্রেসের এই নক্কারজনক নীতির নাগপাশ থেকে গান্ধিজী আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। নিয়ম-তান্ত্রিক উপায়ে নয়, গভর্মেণ্টের তৈরী আইন অমান্য কোরে গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী কোটি কোটি লোকের বিরুদ্ধতা উদ্বুদ্ধ কোরে, সংহত কোরে, গণ-আন্দোলন সৃষ্টি কোরে দেশের স্বাধীনতা আনতে হবে এই হোলো গান্ধিজীর প্রদর্শিত পথ। স্বরাজ পার্টি আবার দেশকে সেই নিয়ম-তান্ত্রিক আন্দোলনের দিকেই টেনে নিয়ে গেলো। কাউন্সিল

ভবনে বক্তৃতার বাজিখেলা দেখানো হোলো অনেক, রাস্তা কিন্তু একেবারে অসাড়, নিঝুম, প্রাণহীন হোয়ে গেলো। গান্ধিজী চলে গেলেন জেলে আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় আন্দোলনের কোটাল বইয়ে দেবার যে একটি মাত্র লোক ছিলেন সারা ভারতবর্ষে তিনি গেলেন চলে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে।

মনে বড় অশান্তি, কি যে করবো কিছুই ঠাওর কোরে উঠ্‌তে পারছিলুম না। সারা দেশও যেন আমারই মতো দিশেহারা হোয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিলো।

এই রকম যখন আমার মনের অবস্থা তখন আমার এক দাদা সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী আমার বৌঠাকরুণ বরোদা থেকে কলকাতায় এলেন। দাদা সুপ্রকাশ তখন বরোদা মিউজিয়মের কিউরেটার ছিলেন। বৌঠাকরুণ যখন আমাদের বাড়ীতে বউ হোয়ে আসেন তখন তাঁর বয়েস মাত্র দশ আর আমার বয়েস সাত। সেই ছেলেবেলার হাল্‌কা আলোভরা দিনগুলোর অনেক খেলাধূলো দুষ্টুমির সঙ্গী ছিলেন আমার বৌঠাকরুণ। তিনি আর আমার দাদা আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন বরোদায়। সেটা ১৯২২ সালের কথা। বরোদাতে আলাপ হোলো ডাঃ সুমন্ত মেহতার সঙ্গে ও তাঁরি বাড়ীতে আলাপ হোলো ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের সঙ্গে। ইন্দুলাল যাজ্ঞিক তখন গান্ধিজীর অন্যতম শিষ্য, গুজরাটের কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে সেরা বলে গণ্য। ইন্দুলাল আমাকে আহমেদাবাদে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। আহমেদাবাদে পৌঁছলুম সকালে। তখনই সবরমতী আশ্রম দেখবার জন্য রওনা হলুম। নদীতে শুধু বালির ঢেউ চোখে পড়ে, কোথাও কোথাও ক্ষীণ জলের রেখা।

নদীর ধারেই মহাত্মাজীর বাসস্থান। পাথরে তৈরী ছোট্ট বাড়ীটি; বারাণ্ডা আর বারাণ্ডা-সংলগ্ন ঘর। ঘরে দরজার বালাই নেই, কোনো আসবাবও নেই ঘরে। যতদূর মনে পড়ছে যীশু-খৃষ্টের ছবি ঝোলানো ছিল দেয়ালে। অনেকক্ষণ গান্ধীজির কুঠিরে বসে সমস্ত প্রাণ দিয়ে কঠোর তপস্যার শুচিতা অনুভব করতে লাগলুম। আমার বুকের মধ্যে আমার মন যে চির-জাগ্রত বৈরাগী। তাকে বাইরের জীবনের কতো রঙীণ ধুলো দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছি, তবুও সে কি বাগ মানে? যখনই সবরমতী আশ্রমের মতো কোনো জায়গায় গিয়ে হাজির হোয়েছি তখনই সে বুকের পাঁজর ধরে কি ঝাঁকুনিই না মেরেছে আমাকে!

গুজরাটে দু'মাস কাটিয়ে ফিরে এলুম কলকাতায়। শরীর ও মন থেকে অবসাদের ধূলো ঝেড়ে ফেলেছি অনেক পরিমাণে। কাজ করবার জন্যে তাগিদ আস্‌তে লাগলো মনের ভিতর থেকে, কিন্তু ঠিক কি যে করবো তা স্থির কোরে উঠ্‌তে পারছিলুম না। যা হাতের কাছে পাই তাই পড়ি, গান গাই, বাঁশী বাজাই, সকাল সন্ধ্যে নিয়মিত ব্যায়াম করি, এমনি কোরেই আমার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।

১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে গান্ধিজী ছাড়া পেলেন। তা'র কিছুদিন পরেই দেশবন্ধু হঠাৎ মারা গেলেন দার্জিলিংয়ে। দেশবন্ধুর মৃতদেহ দার্জিলিং থেকে কলকাতায় আনা হোলো। সকাল বেলা আমি আর চপলা শেয়ালদা ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হলুম। ষ্টেশনের ভিতরে, ষ্টেশনের প্রাঙ্গনে, সার্কুলার রোড আর হ্যারিসন্ রোডে লক্ষ লোকের ভীড়। ট্রেণ এলো,

মৃতদেহ ফুল দিয়ে ঢেকে শোভাযাত্রা সুরু হোলো। হ্যারিসন্ রোড আর সার্কুলার রোড যেখানে এসে মিলেছে ঠিক সেইখানে রাস্তার একধারে মোটরের উপরে দাঁড়িয়ে মহাত্মাজী জনতাকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি কলকাতায় চলে আসেন। বিরাট জনতার সঙ্গে আমরাও চল্‌লুম দেশবন্ধুর শব অনুগমন কোরে। পথের ধারের দু'পাশের বাড়ী থেকে ফুল ঢেলে দিতে লাগলো দেশবন্ধুর মৃতদেহের উপর। চৌরঙ্গী হোয়ে শোভাযাত্রা থামলো গিয়ে দেশবন্ধুর বাড়ীর সামনে। সেখানে তাঁর মৃতদেহ নামানো হোলো বাড়ীর সামনে রাস্তার উপর কিছুক্ষণের জন্য। কেওড়াতলা শ্মশানের কাছাকাছি থেকে আমি আর চপলা ফিরে এলুম। আমাদের দুজনেরই মন ভারাক্রান্ত, চপলার চোখ উপরন্তু অশ্রুসিক্ত।

আমার মনের মাটিতে দেশবন্ধুর প্রভাবের কোনো চিহ্ন পড়েনি। তাঁর রাজনীতি আমার মনকে কখনো টানেনি, তাঁর বক্তৃতাও আমাকে কখনও অভিভূত করেনি। গান্ধিজীর বক্তৃতার আর কর্মের স্বাদ পাবার পর আর সব নেতাদের বক্তৃতা, আচরণ ও কর্ম নেহাৎ পান্‌সে ঠেক্‌তে লাগলো আমার কাছে। গান্ধিজী দেশকে যে পর্যন্ত ঠেলে গিয়ে দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের বন্ধ্যা রাজনীতিকে ফসল ফলাবার যে শক্তি তিনি দিলেন, তারপরে দেশবন্ধুর রাজনীতি দেশকে একপাও এগিয়ে দিতে পারেনি।

পৃথিবীর ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে যে উগ্র ন্যাশানালিজম্ দেশের অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে অতীতের

ভালোমন্দর বিচার না কোরে গোটা অতীতটার জয়গান কর্‌তে সুরু করে। যে লোক যতো উগ্র উন্মত্ততার সঙ্গে সেইটে কর্‌তে পারে, দেশের সাধারণ লোকদের কাছ থেকে সে ততো বেশী খাতির আদায় করে নেয়। অন্ধ ন্যাশানালিজমের খেলো ভাবপ্রবণতার ঝোঁকে বাঙালী অনেক বার নিজের দেশের নোংরাকে বুকে চেপে ধরে তার স্তবগান করেছে। হাটের লোক চেঁচিয়ে বাহবা দিয়েছে—আহা! দেশের প্রতি অমুকের কি গভীর ভালোবাসা, দেশের নোংরাটাকেও সে বুকে স্থান দিয়েছে! আসলে কিন্তু এটা ভালোবাসা নয়, এটা নোংরামি বাঁচিয়ে রাখবার সর্বনাশী খেলা। এ কথা আমাদের জানা একান্ত দরকার যে ন্যাশানালিজম্ আর দেশের যেটা মহৎ, সত্য ও সুন্দর সাধনা ও সৃষ্টি, তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এ দুটো একেবারেই এক জিনিস নয়। রামমোহন রায় ভারতবর্ষকে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন, কি শ্রদ্ধাই না তাঁর ছিলো ভারতবর্ষের বিরাট সত্য সাধনার প্রতি। তাই বোলে দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে কালীঘাটের পাঁঠাবলি, সতীদাহ প্রভৃতি জঘন্য কুসংস্কার তিনি কখনো মেনে নেন নি কিম্বা তাদের সাফাই গাইতে তিনি কখনো চেষ্টা করেন নি। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরেই তিনি দেশের প্রতি সত্য ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের প্রতি এই সত্য ভালোবাসার উদাহরণ শক্তিমান মানুষেরা তাঁদের কর্মের দ্বারা বারে বারে ধরে দিয়েছেন সকলের সামনে সকল দেশে।

দেশবন্ধু এ পথে গেলেন না। ভাব-বিলাসী বাঙালীর যেখানে দুর্বলতা, ঠিক সেই দুর্বলতার উপর ঝোঁক দিয়ে

বাঙালীর হৃদয় জয় করলেন তিনি। যে চলার পথ গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের অগ্নি-শিখার দহনে শুকিয়ে এসেছিলো সেই পথ দেশবন্ধুর ভাব-রসের বর্ষণে আবার চ্যাট্‌চ্যাটে হোয়ে গেলো। বাঙালী রাজনৈতিক ধুলোটে মন দিলো। ভাব-রসের বর্ষণে চলার পথকে চ্যাট্‌চ্যাটে কোরে তোলাতে আমার ঘোর আপত্তি, ওতে কাদায় পা অবশ হয়ে যায়, চলা যায় না। বাঙালীর মন অতি সহজে জয় করবার জন্যে দেশবন্ধু ভাবোন্মাদনার পন্থা নিয়েছিলেন, হাতে হাতে ফলও পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু এপথ মুক্তির পথ নয়, সর্বনাশের পথ! তা'ছাড়া এক দিকে যেমন ভাব-রসের হোলিখেলা চল্‌লো বক্তৃতায় আর 'নারায়ণ' পত্রিকার পাতায়, অন্যদিকে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক জীবনে সর্বপ্রকার নোংরামির বেপরোয়া আমদানী করা হোলো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করাবার জন্যে যে কি সব জঘন্য কৌশল অবলম্বন কর্‌লো স্বরাজপার্টি, তা' সে দিনের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল প্রত্যেকটি লোক জানে। রাজনৈতিক জীবনের সুর সেই যে নামিয়ে দিলো স্বরাজ-পার্টি তার জের এখনো চল্‌ছে বাঙলা দেশে।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর গান্ধীজি কল্‌কাতায় রয়ে গেলেন এক মাস। দেশবন্ধুর বাড়ীতেই তিনি থাকতেন। একদিন সকালে তিনি জোড়াসাঁকোয় এলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে আমন্ত্রণ জানালেন শান্তিনিকেতনে যেতে, গান্ধীজি সম্মত হোলেন। গান্ধীজি

যাত্রী

যে দিন শান্তিনিকেতনে যাত্রা করলেন, আমিও সেদিন চল্লুম শান্তিনিকেতন। সেবার শান্তিনিকেতনে প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন গান্ধীজি। দু'দিন সকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হলো, আমরা চুপচাপ বসে তাঁদের আলোচনা শুনলুম। ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীজির অভিযান নিয়েই বেশীর ভাগ আলোচনা হোলো। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গান্ধীজি জাতীয়তাবাদের যে বেড়া তুলছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। এতে দেশের অকল্যাণ হবে, আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব হবে, এটা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ধারার বিরুদ্ধ পথ, এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বার বার বলছিলেন। এ জায়গায় গান্ধীজির সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুরের কোনো মিল ছিলো না। একজনের সুরে বাজছিলো শুধু বর্তমান, আর একজনের সুরে ধ্বনিত হচ্ছিলো অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত।

শান্তিনিকেতনের দোতলায় থাকতেন গান্ধীজি। মাঝের বড়ো ঘরটিতে খদ্দরের চাদর-ঢাকা বিছানায় বসে তিনি চর্‌খা কাটতেন আর আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বল্‌তেন। দূর গ্রামগুলি থেকে শত শত লোক রোজ ভিড় কর্‌তো এসে তাঁর বাস-ভবনের চারপাশে, একটি বারের মতো তাঁকে দেখবার জন্যে। সন্ধ্যেবেলা বারাণ্ডায় ক্যাম্পখাটে তিনি শুয়ে থাকতেন, আমরা বসতুম মাটিতে। তিনি আস্তে আস্তে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতেন, দক্ষিণআফ্রিকায় কি ভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলেছিলো তা'র গল্প করতেন। গান্ধীজির সঙ্গেই আমি শান্তিনিকেতন থেকে কল্‌কাতায়

ফিরে আসি। তা'র কিছুদিন পরেই শ্রীমতী এলো কল্‌কাতায়, পরণে তার পাত্‌লা শাড়ী। ঠাট্টা কোরে বল্লুম,—বিলিতী শাড়ী আবার কবে থেকে পরা সুরু হোলো? উত্তরে শুনলুম —এটা বিলিতী সুতোয় বোনা শাড়ী নয়, এটা আহমেদাবাদ মিলের শাড়ী, সুতোও দিশী। বিশ্বাস হোলো না, তর্ক বেধে গেলো। আমি মান্‌তে চাইলুম না যে এতো মিহি সুতো অমাদের দেশে তৈরী হয়। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো গান্ধীজি তো কল্‌কাতায়, তাঁর কাছে গেলেই তো মীমাংসা হোয়ে যায়! ছুটলুম দু'জনে দেশবন্ধুর বাড়ী। রাস্তার দিকের বারাণ্ডায় মাটিতে পাতা বিছানায় বসে ছিলেন গান্ধীজি। হেসে অভ্যর্থনা করলেন আমাদের। মাটিতে বসলুম দু'জনে, জানালুম তাঁকে তাঁর কাছে ছুটে আসবার হেতু। আমার হার হোলো।

বর্ষা ঘনিয়ে এলো। আকাশে কালো মেঘের ছুটোছুটি। লালবাড়ীর (বিচিত্রাভবনের) কোণে কদমগাছ ছেয়ে গেলো ফুলে ফুলে। হঠাৎ খেয়াল হোলো বর্ষার গানের মজলিশ কোরলে তো হয়! অমনি বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে গান শেখাতে সুরু করলুম। সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত কোরে রবীন্দ্রনাথকে লিখলুম কল্‌কাতায় আস্‌তে। তিনি এলেন, বিচিত্রাভবনের দোতালায় হোলো গানের আসর। রবীন্দ্রনাথ বসলেন আমাদের সামনে, পড়ে শোনালেন দু'টি কবিতা। তা'র পরের বার বর্ষা-মঙ্গলের আয়োজন করলুম বিচিত্রা-ভবনের একতলায়। নন্দিতা তখন সাত আট বছরের, নাচ্‌লো সে "কদম্বেরি কানন ঘেরি" গানের সঙ্গে। কনক দাসের গলায়

মা চারুবালা দেবী ও সৌম্যেন্দ্রনাথ

'অশ্রুভরা বেদনা' রসের আবেশে মন্থর কোরে তুল্‌লো শ্রোতাদের মন। গানের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দিলো রজনী-গন্ধার গন্ধ, কেয়ার সুরভি।

নানা রঙের সুতোয় বোনা আঁ‍ল্‌লার মতো আমার জীবনটা তখন নানা রঙে রঙীন। তখনো একরঙা হোয়ে যায় নি জীবন।

চল্‌ছি, মনের মধ্যে পথ নেই, শুধু চলার অভ্যেসের ঝোঁকে চলেছি। এই অর্থহীন চলা আমি চলছিলুম এই সময়। চৌরিচৌরার পর গান্ধীজি যখন আন্দোলন বন্ধ কোরে দিলেন তখন আঘাত পেয়েছিলুম মনে। কোথায় একটা গলদ আছে সেটা অনুভব করছিলুম, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে সেটা ধরতে পারছিলুম না। গভীর অসোয়াস্তি আঁচড়ে চলেছিলো বুকের মধ্যে। যে চলার পথ মনের মধ্যে জেগে উঠেছিলো, সেই আলোয় ঝল্‌মল্‌-করা দিগন্ত-ছোঁওয়া পথ হঠাৎ যেন ছোটো হোয়ে গেলো, সরে এলো হাতের নাগালের মধ্যে। দূরের ডাক আর বাজলো না সেই পথে, মনে হোতে লাগ্‌লো এ পথ আর মুক্তির দূতী নয়, এ পথ পায়ের শিকল, কারাগার। মনের মধ্যে সেই ছোট্ট পথে এগোচ্ছি আর পেছচ্ছি মাকুর মতো। কোনই আনন্দ পাচ্ছিনে সে চলায় অথচ অন্য পথও নজরে পড়ছে না। এই অবস্থায় পড়ে আমার মন সে দিন নাজেহাল।

গান্ধীজির আর গান্ধীজির মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সেদিন ছিলেন দেশবন্ধু আর ছিলো তাঁর কর্মপদ্ধতি। স্বরাজ পার্টির নেতারা কিম্বা ঐ দলের মজলিশি নিয়মতান্ত্রিক বক্তৃতা-সর্বস্ব রাজনীতি,—এ দুয়ের কোনটাই আমার মনকে স্পর্শ করেনি।

স্বরাজ পার্টির রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি মানা, পথ থেকে ড্রইং রুমে ফিরে যাওয়ার সামিল। আমি আদবেই রাজী ছিলুম না তা'তে। গান্ধীজি যে পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে, সে পথের সত্যিকার স্বাদ পেয়েছিলো আমার মন। সে পথ যখন ছোট্ট বলে মনে হোতে লাগলো তখন এগিয়ে যাবার জন্মে ব্যাকুলতা জাগলো মনে। যে পথ দিগন্ত-প্রসারী বলে মনে হোয়েছিলো সে পথ কেন ছোট হোয়ে গেলো, কেন আলো সরে গেলো পথের বুক থেকে, আবার কোন্ পথ ধরবো, সে পথই বা কোথায় নিয়ে যাবে—এই সব প্রশ্ন তীরের মতো অহরহ বিঁধছিলো বুকে। এগিয়ে যাওয়ার কথাই ভাবছিলুম সেদিন, পথ থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবার কথা এক মুহূর্তের জন্মেও মনে আসেনি। স্বরাজ পার্টির পলিটিক্যাল সাইনবোর্ড আঙ্গুল দেখাচ্ছিলো পেছনে ঘরের দিকে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার দিকে নয়। আইনের বাঁধ-ভাঙা গণ-আন্দোলনের বিদ্রোহী জোয়ারের সঙ্গে কোলাকুলি করবার পর এ যেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের খিড়কীর পুকুরের পচা জলে চোখ কান বুজে ডুব দেওয়ার ব্যবস্থা! দেশের জনসাধারণ স্বরাজ পার্টির রাজনীতি কখনো গ্রহণ করেনি। গ্রহণ করেছিলো শুধু উকীল, ব্যারিষ্টার, ব্যবসায়ী আর জমিদার, এক কথায় সমাজের উপর তলার আর মাঝের তলার বাবুদল। এই বাবুরা তেতলা-দোতলায় যে রাজনৈতিক হুল্লোড় করতেন তার ধ্বনি সমাজের বিরাট একতলায় কখনো পৌঁছয়নি। বাবুদের চিকণ কণ্ঠে আর যাই থাক্, এ তাগদ আদবেই ছিলো না!

যাত্রী

মনের মধ্যে অশান্তি বেড়েই চলেছে। আগে যেমন নিঃসংশয় আনন্দে গান্ধীজির কথা গ্রহণ করেছিলুম, সেটা আর পারছিলুম না। বাস্তবের ধাক্কায় গান্ধীজির মতবাদের মধ্যে অনেক ফাটল দেখা দিলো। চরখার সুতো দিয়ে ব্রিটিশ সিংহীকে আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে সাগর পার কোরে দেওয়া সম্ভব হবে, এই কল্পনায় মন আর সায় দিচ্ছিলো না। ব্রিটিশ বেনের পকেটে লুটের টাকা কিছু কমে যেতে পারে, আগের মতো ভরা না থেকে পকেটটা কিছুটা চুপ্‌সেও যাবে হয়তো, কিন্তু তাতেই বা হবে কী? যে বিরাট লুট করে চলেছে বৃটিশ বেনের দল ভারতবর্ষে, তা'র কতোটুকু অংশই বা সেটুকু যেটুকু বিলীতি কাপড়ের সিঁধ কাঠি দিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে নিয়ে যায় তা'রা? চরখার সুতো দিয়ে বৃটিশ সিংহীর নাকে সুড়সুড়ি দেওয়া যেতে পারে, তাতে তা'র ঘুমের অসুবিধা হবে হয়তো কিছুটা, কিন্তু তাই বলে সুড়সুড়ি দিলে সে ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাবে এ কথা আষাঢ়ে বলে মনে হোতে লাগল। চরখার সমর্থনে আর একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছিলো তখন। এই যুক্তি-দেখানেওয়ালাদের মতে চরখার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে আমরা যোগ স্থাপন করতে পারবো। চরখা হোচ্ছে গণ-সংযোগের উপায়। এই যুক্তিটা মানতে একটুও বাধা ছিলো না, শুধু বাধা সৃষ্টি করলেন এই যুক্তির সমর্থকেরা চরখাকে গণ-সংযোগের এক-মাত্র উপায় বোলে মানিয়ে নেবার জন্যে জবরদস্তি সুরু কোরে। নানা উপায়ে জনসাধারণের সঙ্গে যোগস্থাপন করা যায়, চরখা তা'র একটা উপায়। বিনি পয়সায় কিম্বা অতি

অল্প মূল্যে ওষুধের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কোরে দিয়ে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কোরে, সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন কোরে, জমিদার মহাজনদের অত্যাচার থেকে চাষীদের বাঁচাবার জন্যে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ গঠন কোরে, এই রকম কতো শত উপায় আছে জনসাধারণের মনে পৌঁছবার। জনসাধারণের মনে পৌঁছবার জন্যে দরকার দরদী মন। এই মনটা থাকলে উপায়ের কম্‌তি কখনো হয় না। কে বল্‌লে যে একমাত্র চরখার চাকা ঘুরিয়েই পথ কেটে যাওয়া যায় জনসাধারণের মনের দিকে, আর কোনো উপায়েই সেটা সম্ভব নয়! চরখাই গণ-সংযোগের একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ উপায় এই যুক্তিহীন গোঁড়ামি প্রচার কোরেছিলেন সেদিন গান্ধীবাদীরা চরখা চালু করবার যুক্তি স্বরূপ। এই অন্ধ গোঁড়ামি স্বীকার করে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। জীবনের সমস্যা ও তাদের সমাধানের বহুমুখী উপায় চিরকালই থাকবে। একটা মনগড়া একপেশে সমাধান তৈরি কোরে সেইটিকে সমস্যা-সমাধানের একমাত্র উপায় বোলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা প্রমাণ করে বিচার-বুদ্ধির অভাব, বিশ্লেষণ-ক্ষমতার দৈন্য ও মনের আল্‌সেমি। বাজারে এই একপেশে টোটকাগুলোর কাট্‌তিও হয় বেশ, শুধু হয় না সমস্যার সমাধান, এই যা। জীবনের সমস্যা-গুলির যে স্বভাবগত জটিলতা আছে তার চেয়েও তাদের মনগড়া বেশী জটিলতা আরোপ করা হচ্ছে ভাব-বিলাসীদের একটি অতিবুদ্ধির ঢঙ, তেম্‌নি আবার একটি সমস্যার বহুমুখি প্রকৃতি বিশ্লেষণ না কোরে তা'র প্রকৃতির একটি বিশেষ দিককে তার গোটা প্রকৃতি বলে কল্পনা কোরে নিয়ে সমাধানের

বিধান দেওয়া অল্পবুদ্ধির ব্যভিচার। মানছি যে এই ধরণের কাল্পনিক সমাধান সহজ আর সহজ বলেই আল্‌সে মনের মালিকেরা এটা করে থাকে; কিন্তু এই সব সমাধানে মগজের ছাপ আদবেই নেই। ভাব-রসের বেলায় সহজিয়া পথ ধরা চলে, অন্তত লোকে ধরছে সে পথ। বিচারের ক্ষেত্রে কিন্তু সহজিয়া সাধনা সর্বনাশের চোরাবালি, আলেয়ার হাতছানি। খিলাফৎ-আন্দোলনকে আমাদের দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গান্ধীজি যে ভয়ানক ভুলটি করেছিলেন সেটিও আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলুম এই সময়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগদান করবার জন্যে ইস্‌লাম ধর্মে বিশ্বাসী একদল ভারতীয়দের খিলাফথের ঘুঁস দিয়ে স্বাধীনতার লড়াইতে টানতে হবে এটা গোড়া থেকেই আমার কাছে অশোভন ঠেকেছিলো। অল্পদিনের মধ্যেই বাস্তবের আলোতে পরিষ্কার ধরা পড়ে গেলো যে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের টান দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের দিকে ততোটা নয় যতোটা খিলাফৎ-আন্দোলনের দিকে। যেটুকু তাঁ'রা যোগ দিয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সেটা খিলাফৎ-আন্দোলনের ফায়দা হবে এই আন্দোলনে যোগ দিলে, এই পাটোয়ারী বুদ্ধির হিসেব কসারই ফল। ইস্‌লামের বিশ্বব্যাপী ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীকরণ বিপ্লবমূলক আন্তর্জাতিকতার বিরোধী তো নিশ্চয়ই, এমন কি বুর্জোয়া আন্তর্জাতিকতারও বিরোধী। ইস্‌লামের এই ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীকরণ আন্তর্জাতিকতা তো নয়ই, এমন কি এটা জাতীয় বিপ্লবেরও বিরুদ্ধ শক্তি। ইসলামপন্থীরা যে দাবী করে থাকেন যে তাঁরা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা-বাদী নন, তাঁরা আন্তর্জাতিকতার উপাসক, সে দাবী এই

ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতাকে আন্তর্জাতিকতা বলে চালিয়ে দেবার ফাঁকির উপর প্রতিষ্ঠিত, ঠিক যেমন ইসলামের মাসাওয়াৎকে (সমতাকে) অর্থাৎ ধনী গরীবের একই সঙ্গে নামাজ পড়ার রীতিকে কমিউনিজমের সমতার নজীর হিসেবে চালিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা বিলকুল ফাঁকি। ইস্‌লামের এই ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতাকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে চূর্ণ বিচূর্ণ কোরে দিয়েছিলেন কেমাল পাশা, বিদায় কোরে দিয়েছিলেন তাকে তুর্কী থেকে। তবেই না নব্য তুর্কীর বিপ্লবপন্থী জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে তুর্কিকে মুক্ত কোরতে পেরেছিলো। মৌলানা শৌকৎ আলী বৃটিশ গভর্মেন্টের অর্থে তুর্কী গিয়েছিলেন খলিফার হোয়ে ওকালতী করবার জন্যে। সেখানে গোঁড়ামিমুক্ত আগুয়ান-পন্থী মুসলমানদের হাতে প্রতিক্রিয়ার মেদময় মূর্তি এই মৌলানা যে কি জবরদস্ত লাঞ্ছিত হোয়েছিলেন তা' রাজনীতির খবরদারী-করনেওয়ালারা সবাই জানেন। এই ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতাকে আঘাত তো কোরলেনই না গান্ধীজি, এমন কি তিনি এই উন্মত্ত গোঁড়ামির পাশ কাটিয়েও গেলেন না। এই খলিফা-কেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিক অন্ধতা কামাল পাশার প্রবল আঘাতে মুস্‌ড়ে পড়েছিলো, ও দম নিয়ে ঠেলে ওঠবার জোর খুইয়ে বসেছিলো। খিলাফতের চুপ্‌সনো বেলুনে হাওয়া ভরে দিলেন গান্ধীজী। তিনি পুষ্ট করলেন ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লব-বিরোধী এই প্রতিক্রিয়াকে। কামাল পাশার লাথি খেয়ে যে দানব কলসীর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো ও ছিলো বন্দী সেখানে, কলসী খুলে সেই দানবকে মুক্তি দিলেন গান্ধীজি। তার ফলে যে শুধু ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লবের সর্বনাশ করা হলো তা নয়, গোঁড়ামীর

বিষাক্ত বাষ্পকে উড়িয়ে দেবার জন্যে ইসলামীয় দেশগুলিতে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার যে পূরবৈয়া বায়ু বইছিলো, তাকে হটিয়ে দিয়ে সেই দেশগুলিতে সনাতনী প্রতিক্রিয়ার দুর্গন্ধময় বাষ্পকে আবার চাঙ্গা হোয়ে থিতিয়ে বস্‌তে সাহায্য করলেন গান্ধীজি। হিন্দুদের দুর্ব্যবহার উপেক্ষা কোরে, ইংরেজের মতলবী উস্‌কানি অগ্রাহ্য করে, ভারতবর্ষের মুসলমান আস্তে আস্তে শিখছিলো ভারতবর্ষকেই আপনার বোলে বুঝতে, জানতে ও ভালোবাসতে। যে কোনো উপায়ে অসহযোগ-আন্দোলনের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের টেনে নেবার জন্যে খিলাফৎ-আন্দোলনে কংগ্রেসের সমর্থনের ঘুঁস দিলেন তিনি তাদের। গান্ধীজিই তাদের দৃষ্টি ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতার দানবের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। এমনি কোরে তিনি সেদিন ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির অভাবে নিজের অজানিতে সর্বনাশের যে বীজ বুনলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, পাকিস্তান হোলো তারই ফসল।

স্বাধীনতা-আন্দোলন থেকে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের সরিয়ে নেবার জন্য সুচতুর বৃটিশসাম্রাজ্যবাদীরা খিলাফতের দাবী মেনে নিলো, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা-আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানদের যেটুকু স্রোত বইছিলো তাতে ভাঁটা পড়ে গেলো। শৌকত আলি, মহম্মদ আলি স্বমূর্তি ধরলেন, গোষ্ঠীর লোকদের খুসী করবার জন্যে জাতীয়তাবাদের আল্‌খাল্লা তাঁরা সাত তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেল্‌তেই তলা থেকে বের হোয়ে পড়লো তাঁদের আসল সাম্প্রদায়িক সাজ—চাঁদমার্কা টুপি আর সবুজ আলখাল্লা।

হিন্দু সমাজকে খুসি করবার জন্যে গান্ধীজি জাতিভেদ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখলেন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তা'তে আমি দুঃখ

পেয়েছিলুম। আমার পক্ষে জাতিভেদ মানা কোনমতেই সম্ভব ছিলোনা। এই প্রবন্ধে হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণভাগকে গান্ধীজি শাশ্বত সমাজ-ব্যবস্থা বোলে বর্ণনা করলেন। জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারণ সম্বন্ধে পুনারাবৃত্তি কোরে গান্ধীজি দেখালেন যে প্রাচীন কালের সামাজিক ব্যবস্থায় কাজ ভাগ কোরে বেঁটে নেওয়ার চাহিদার তাগিদেই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি। এই ঐতিহাসিক আলোচনায় নতুন কোরে শেখবার কোন কিছু না থাকলেও আপত্তি করবার কিছু ছিলো না। প্রত্যেকটি সামাজিক প্রথার উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেই ঐতিহাসিক কারণের দোহাই দিয়ে তাকে শাশ্বত বোলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা অবৈজ্ঞানিক তো নিশ্চয়ই, অনুচিতও। ঐতিহাসিক বিচার-পদ্ধতি আর যা প্রমাণ করুক না করুক এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে একটি প্রথার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হোয়ে যাবার পর সেই প্রথার সামাজিক জীবনে জায়গা জুড়ে থাকবার কোনো ঐতিহাসিক কিম্বা সামাজিক অজুহাত নেই। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও যে তা'রা থেকে যায় তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে থাকা মানুষের চলার পথের বাধা সৃষ্টি করে, সমাজের ধেয়ে-যাওয়া এগিয়ে-চলা স্রোতের মুখে রচনা করে মরা বালির বাঁধ। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ-প্রণালী ও বিচার-পদ্ধতি গান্ধীজি ব্যবহার করলেন বর্তমান কালে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্বের সাফাই গাইবার জন্যে। ঐতিহাসিক বিচার-পদ্ধতি যেটা প্রমাণ করে সেটা হচ্ছে প্রতিটি সামাজিক প্রথার ও সামাজিক সংগঠনের সাময়িকতা, তা'র অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন কিম্বা বিলুপ্তি। এই বিচার-পদ্ধতির একেবারে

অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার কোরে ঠিক বিপরীতটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন গান্ধীজি। তিনি অস্পৃশ্যতার নিন্দা করলেন বটে কিন্তু তা'রই সঙ্গে হিন্দুসমাজের বর্ণবিভাগকে শাশ্বত বলে জাহির করলেন।

চতুর্বর্ণ প্রথাই যে অস্পৃশ্যতার হেতু, এই প্রথা যে মানুষের পক্ষে অসম্মানজনক ছোঁওয়াছুঁয়ির কলুষে ভরা, সেই কথা গান্ধীজি বেবাক এড়িয়ে গেলেন! তাঁর মামুলি যুক্তির বাঁধুনি ছিলো ঢিলে ঢালা; তাতে ফাঁক ছিলো যথেষ্ট। কিন্তু ভক্তদের ভক্তি-আবিল চোখে কবে কোনদিন গুরুর কথার ফাঁক ধরা পড়েছে! ভক্তির মৌ দিয়ে রচা মনের মৌচাক একেবারে নীরেট, সেখানে বুদ্ধির মধু ভরবার এতোটুকু ফাঁক থাকে না। গান্ধীজির ভক্তদের মনের মৌচাকে সেদিন এতোটুকু ফাঁক ছিলো না। অন্ধ ভক্তির মোম দিয়ে প্রতিটি ফাঁক বুজিয়ে দিয়েছিলো ভক্তেরা, আর এই ফাঁক না থাকাটাই তা'রা পরম সৌভাগ্য বলে ধরে নিয়েছিলো।

যে আবহাওয়ার ছাঁচে আমার মনের কাঠামো ঢালাই হোয়েছিলো সে আবহাওয়ায় ভক্তির আবিলতা ছিলো না, শ্রদ্ধা ছিলো, কিন্তু সে শ্রদ্ধা ছিলো বিচারশীল। ভাবালুতার ফেনায় চোখ কান নাক ভরে নিয়ে সব কিছু নির্বিচারে গ্রহণ করবার নির্দেশ ছিলো না সেই আবহাওয়ায়। বিচার, গ্রহণ ও বর্জন এই তিনটি খুঁটির উপরই না চিন্তার ইমারৎ রচনা। এর একটি খুঁটিও সরানো চলে না, সরালে চিন্তার ইমারৎ ধ্বসে পড়বেই। আমাদের পরিবারে পৈতে নেওয়ার রেওয়াজ ছিলো। পৈতে নিতে আমার অমত জানিয়ে দিই আমার পিতাকে।

তিনি যদি জোর করতেন তাহলে আমাকে পৈতে নিতেই হোতো, কিন্তু জোর করে কাউকে কিন্তু মানাবার লোক তিনি ছিলেন না। তাঁর চরিত্রের আভিজাত্য ও উদারতা এমনই ছিলো যে কাউকে জোর করে কিছু মানাবার অশালীনতা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমি পৈতে নিই নি। আমার পৈতে না নেওয়ার পরে পৈতে নেওয়ার রেওয়াজ উঠেই গেলো আমাদের পরিবারে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে ও আমাদের পরিবারে হিন্দুয়ানির গোঁড়ামী যথেষ্ট ছিলো। পৈতে নেওয়ার রেওয়াজ তার মধ্যে একটি। আমাদের বাড়ীর ছেলে মেয়েদের ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দেবার কড়া অনুশাসন ছিলো। অন্য জাতের সঙ্গে বিয়ে ছিলো নিষিদ্ধ। এই সব সনাতনী রীতি বহুদিন থেকে চলে আসছিলো আমাদের বাড়ীতে। আমার বেড়া-ভাঙ্গা মন ধাক্কা খেতে লাগলো এইসব কুৎসিৎ অর্থহীন নিষেধের বেড়াতে। আমার মন ফণা তুলে গর্জে উঠলো বাড়ীর এই সব সনাতনী রীতির বিরুদ্ধে। তাই হিন্দুয়ানীর জাতের গোড়ামি বাঁচানোর জন্যে গান্ধিজীর প্রচেষ্টা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কোনো মতেই সম্ভব ছিলো না।

গান্ধীবাদের উপর আমার নিটোল বিশ্বাস এমনি কোরে টোল খেলো। বাস্তবের আঘাতে বিশ্বাস তুবড়ে গেলো বটে কিন্তু ভেঙ্গে যায়নি। আমার তূণে তখন কমিউনিষ্ট মতবাদ ও অনেকান্ত ভূতবাদের (ডায়লেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম্) ধোঁওয়া-নাশন তীরগুলো জোগাড় করা হয়নি। গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলো আমার সংস্কার। যে সংস্কারের ছাঁচে আমার জীবন্ ঢালাই হোয়েছিলো সে সংস্কার সহজে হার-

মানেনেওয়ালা ছিলো না। আমার বাড়ীর সংস্কারকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি গান্ধীজির টানে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলুম, গান্ধীবাদ গ্রহণ করেছিলুম। আমি আগেই বলেছি যে সেই গ্রহণের মধ্যে বিচার ছিলো না, ছিলো আবেগের বাষ্প বৃটিশ-বিদ্বেষ আর ছিলো স্বাধীনতার তৃষ্ণা।

ঘটনার পর ঘটনার আঘাত হেনে বাস্তব-রাক্ষসী যখন আমার বুকের পাঁজর ধরে ঝাঁকাতে সুরু করলো তখন সুরু হলো বিচার। যখন আন্দোলনের জোয়ার বইছিলো তখন এত মুগ্ধ ছিলো আমার মন গণ-আন্দোলনের ঢেউয়ের গর্জন শুনে যে বিচার করবার শক্তিই আমার ছিলো না। আবেগ আর দেশের প্রতি ভালোবাসার সুতো দিয়ে বোনা আমার একান্ত বিশ্বাসের দুস্মৃতিকে ঘটনার তপ্ত লোহার ছেঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দিলো বাস্তব। তখন সেই দুস্মৃতির ঠাস-বুনুনির বুক জুড়ে দেখা দিলো বহু ফুটো। তবুও গান্ধীবাদ থেকে আমার মন তখনও একেবারে সরে যায় নি। বিনামূল্যে পাওয়া আমার বংশগত সংস্কারের ধাক্কায় গান্ধীবাদকে আমার মন থেকে একেবারে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিলো না। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর সংস্কারের মধ্যে অনেক কিছু ছিলো যা অমিত শক্তিশালী, অন্য দিকে তার মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিলো যা জমিদার-পরিবারের বনেদী দুর্বলতার ক্লেদে কলুষিত। চিন্তার উদ্দেশ্য চিন্তাই, এই ভাব-বিলাসিতা ছিলো সেই সংস্কারের মধ্যে। জন সাধারণ থেকে বিছিন্ন ভাব-বিলাসী আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সংস্কার শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিলো আমাদের বাড়ীতে। দু'মুখো তরোয়ালের মতো, এই দু'মুখো সংস্কারের চিন্তার দিক ও রস-সৃষ্টির দিক ছিলো খরধার

আর কর্মের দিকটা ছিলো ভাব-বিলাসে মর্চে-পড়া, ভোঁতা। এই সংস্কারের বুনুনিতে চিন্তার ও কর্মের মধ্যে আত্মিক ঐক্যের অভাব থাকায় চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক যায়গায় এই সংস্কার গান্ধীবাদের অসারত্ব প্রমাণ করলেও তাকে পরাস্ত করতে সমর্থ হোলো না। আমি তখন হাত্‌ড়ে ফিরছি এমন একটি মতবাদ যে মতবাদে চিন্তার সঙ্গে কর্মের বিরোধ নেই, অসঙ্গতি নেই, আড়ি নেই।

এমনি কোরে হাত্‌ড়ে ফির্‌ছি আমি এমন সময় হঠাৎ একদিন একটি বই হাতে পড়্‌লো। আমার ছিলো পুরাণো বইয়ের দোকানগুলোতে যাওয়ার মৌতাত। বড় ভালো লাগ্‌তো পথের ধারে দাঁড়িয়ে বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে। কলেজষ্ট্রীটে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির পিছনে একটি পুরোণো বইয়ের দোকান ছিলো। কলেজে পড়বার সময় রোজ একবার সেই দোকানে ঘুরে যেতুম। পরেও যখন ও ধার দিয়ে যেতুম একবার সেই দোকানে উঁকিঝুঁকি না মেরে চলে যেতে মন সরতো না। একদিন বিকেলে এই পুরণো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি বই নজরে পড়্‌লো। বইটির নাম—'দি সোশালিষ্ট ফ্যালাসিজ'। একটু উল্টে পাল্টে দেখে বইটি কিনে ফেল্‌লুম। কলেজে পড়বার সময় অর্থনীতিতে ছিলো আমার ঝোঁক, ইকনমিক্‌সে অনার্স নিয়ে আমি বি. এ. পাশ করি। কলেজে নামী জাঁদরেল অধ্যাপকদের কাছে পড়েছি—কয়াজী, সেনগুপ্ত, এঁরা আমাদের অর্থনীতি পড়াতেন। মার্শাল, পিয়ারসন্‌ প্রভৃতি যে সব অর্থ-নীতিবিদদের বই আমরা পড়তুম সে সব বই এই ধনতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোটিকে অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্য বলে মেনে নিয়ে এই

সমাজ-ব্যবস্থায় সওদার দাম, মজুরের মজুরী, জমির খাজনা, উৎপাদকের মুনাফা কি ভাবে নির্ণয় হবে সেটা আমাদের শেখাতো। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থক ও সাফাই-গানেওয়ালা অর্থ-নীতিবিদ্‌দের বই প'ড়ে এই সমাজ-ব্যবস্থার যথার্থ উৎপাদক যারা সেই চাষী-মজুরদের কি ভাবে ঠকানো হয় তা'র কোনো হদিশ আমরা পাই নি। প্রকৃতির এলাকায় যেমন দেহের আয়তনের বৈষম্য রয়েছে, সব মানুষ তো আর ছ' ফিট উঁচু নয়, কেউ বা ছ' ফিট, কেউ বা সাড়ে পাঁচ, তেম্‌নি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনী, গরীব থাকবে এটা স্বাভাবিক, এটা প্রকৃতির নিয়ম! ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এই হাস্যকর সাফাই আমরা অহরহ শুনতুম অধ্যাপকদের মুখ থেকে। সোশালিজম্‌ আমাদের পড়ানো হোতো না আদবেই, তবে সোশালিষ্ট মতবাদের প্রহসন কোরে সেটাকে সোশালিজম্‌ বলে চালিয়ে দিয়ে তা'র বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি আছে সেইটে আমাদের শোনানো হোতো। সোশালিজমের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দেওয়া হোতো তাদের মধ্যে একটি যুক্তি আজও আমার মনে আছে। যুক্তিটি ছিলো এই—সোশালিজম্‌ বলে ধনী শ্রেণী না থাক্‌লে গরীবদের দুঃখ দূর হবে, তা কি কখনো হয়? হিমালয়টা গুঁড়ো কোরে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিলে, পৃথিবীর উচ্চতা কতোটুকু বাড়বে? এই আষাঢ়ে যুক্তি সোশালিজমের বিরুদ্ধে চরম যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতেন আমাদের অধ্যাপকেরা! বুদ্ধির এম্‌নি মূর্তিমান ভরা-ডুবি ছিলেন আমাদের অধ্যাপকেরা আর এম্‌নি অশিক্ষার ঘানিতে জুড়ে দিয়ে আমাদের বছরের পর বছর ঘুরিয়ে মারা হোতো। আর একেই বলা হোতো শিক্ষা-ব্যবস্থা!

যাত্রী

সোশালিজম্ সম্বন্ধে কিছুই সত্যি করে জানতুম না তখন, অধ্যাপকদের কৃপায় যেটুকু জানলুম সেটুকু হচ্ছে এই যে সোশালিজম্ একেবারে দেউলে মতবাদ, ওটা খ্যাপামি ছাড়া আর কিছু-ই নয়। ধনী গরীব থাকবেই ওটা চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব ধিক্ সোশালিজম্‌কে, শত ধিক্! যারা সোশালিজমের কথা বলে তারা ধিক্ তো বটেই, উপরন্তু তারা নিপাত হোক্।

তবুও মনের মধ্যে অসোয়াস্তির আগুন ধিক্ ধিক্ জ্বলতেই লাগলো। অধ্যাপকেরা তাঁদের যুক্তির ভিজে ন্যাকরা জড়িয়ে এই আগুন নেবাবার যতো চেষ্টাই করুন না কেন, এ আগুন নিবোতে পারলেন না। তাঁদের যুক্তির বিরুদ্ধে খাড়া করি এমন যুক্তি আমার জ্ঞানের অস্ত্রাগারে ছিলো না সেদিন। তবুও মন মানছিলো না সেই যুক্তিগুলো। এই অত্যাচার, অনাহার, ও হাহাকার এটা মানব-সমাজের চিরন্তন নিয়ম কখনোই হোতে পারে না এ কথা বার বার বলছিলো আমার মন। জ্ঞানের হাজার-মহল বাড়ীতে কতো ধরণের বিষয়-বস্তু কতো মহল জুড়ে রয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয়-বস্তুর নিজস্ব মহল আছে, তা'র অভিব্যক্তির বিশেষ নিয়মও আছে। তবুও সেই হাজার মহল বাড়ীর প্রত্যেক মহলের সঙ্গে অন্য মহলের যোগ আছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়-বস্তুর উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি একটি বিশেষ নিয়মে বিধৃত হোলেও সব বিষয়-গুলির মধ্যে একটা যোগসূত্রও আছে। বিষয়-বস্তুগুলির টুক্‌রো টুক্‌রো আলাদা আলাদা নিয়মগুলোর মধ্যের এই যে যোগ-সূত্র এটা আসলে কি? এটা কি একটা আধিদৈবিক নির্বস্তুক

যোগসূত্র? আদবেই তা নয়, এ যোগসূত্র হচ্ছে সম্পূর্ণ আধিভৌতিক, মানবীয় যোগসূত্র। মানব-সমাজের কল্যাণের অখণ্ড যোগসূত্রে এই বিষয়গুলির খণ্ড জ্ঞানকে গেঁথে নেওয়াই হচ্ছে মানুষের জীবনের ব্রত। আর এই চেতনাও মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বহু সংঘাতের ফল। তাই অর্থনৈতিক যুক্তি যদি বৈষম্যের সাফাইও গায়, বহু দুঃখ-লব্ধ মানুষের সামাজিক চেতনা তাকে অস্বীকার করবেই করবে।

'সোশালিষ্ট ফ্যালাসিজ্' বইটি নিয়ে বাড়ী ফিরেই পড়তে সুরু করলুম। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমবায় সমাজ-ব্যবস্থা-স্থাপন করবার যতো স্বপ্ন মানুষ দেখেছে, কাল্পনিক সোশালিজম্ থেকে বৈজ্ঞানিক সোশালিজম পর্যন্ত, সমস্ত মত-বাদকে লেখক অসার, যুক্তিহীন প্রমাণ করবার জন্যে এই বইটি লিখেছেন। সোশালিজমের শত্রুর লেখা এই বইখানি পড়ে সোশালিজমের যথার্থতা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় হলুম। সোশালিজমের স্বপক্ষের যুক্তি যেগুলো লেখক ভ্রান্ত বলে দেখাতে চেষ্টা করেছেন সেগুলো আমার কাছে অকাট্য অভ্রান্ত যুক্তি বোলে মনে হোলো। সুরু করলুম সোশালিজম্ সম্বন্ধে পড়াশুনো। কিন্তু কি বই যে পড়বো সোশালিজম্ সম্বন্ধে এ বিষয়ে কিছুই সত্যি করে জানা ছিলো না। সে দিনের কথা যখন কখনো কখনো মনে পড়ে তখন আমাদের তখনকার অবস্থা মনে করলে নিজেদের তারিফ কোরতে ইচ্ছা করে। সোশালিজম্ সম্বন্ধে কিছুই তখন জানতুম্ না, আজকের মতো জানার সুযোগও তখন ছিলো না। সোশালিজম্ সম্বন্ধে বই তখন এদেশে আস্‌তো না বল্লেই চলে। এমন কাউকে জানতুমও না যার

কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন সাহায্য পেতে পারি। আমরা যারা সেদিন এ পথে এসেছিলুম আমাদের মধ্যে আন্তরিকতার একটা প্রচণ্ড আবেগ ছিলো। জান্‌তেই হবে, শিখ্‌তেই হবে, নিজেদের তৈরী কর্‌তেই হবে কাজের জন্যে, এই ছিলো আমাদের প্রাণের কথা। আজকে যেমন মতবাদ রেঁধে বেড়ে পরিবেশন কোরে দিলেও সেটা একটু কষ্ট কোরে তুলে খেতেও এ কালের ছেলেমেয়েরা রাজী নয়, আমাদের সময়ে ঠিক এর বিপরীতটা ছিলো সত্যি। জান্‌বার তৃষ্ণায় অধীর হোয়ে কি পাগলের মতো ছুটোছুটিই না করেছি আমরা, কি আকাশ পাতাল হাত্‌ড়াতেই না হয়েছে আমাদের! আমেরিকা-ফেরৎ এক আত্মীয়ের কাছ থেকে জন স্পার্গো বলে এক ভদ্রলোকের লেখা মার্কসের জীবনী পেলুম। এক নিশ্বাসে চুমুক দেওয়ার মতো কোরে পড়ে ফেল্‌লুম বইটা। সেই বইতে পেলুম সোশালিজমের উপর কয়েকটি বইয়ের ফর্দ, মার্কসের ও এঙ্গেল্‌সের লেখা বইগুলোর তালিকা। বইয়ের দোকান, লাইব্রেরী হাত্‌ড়ে 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' যোগাড় করলুম। পড়্‌লুম বটে কিন্তু তা'র অনেক কিছুই বুঝতে পারলুম না। চিন্তার এত ঠাস্‌বুনুনি এই ছোট্ট বইটিতে যে ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি এইগুলির যুত্‌সই জ্ঞান না থাকলে ওর আসল মর্মটি পূরোটা ধরা যায় না, কেমন যেন পিছলিয়ে যায়। কিছুটা কিছুটা বুঝলুম, কিছুটা কিছুটা তলিয়ে গেলো, হারিয়ে গেলো। এই সময়ে রুশীয় বিপ্লব সম্বন্ধে লেখা প্রাইসের বইটা হাতে এলো। হাতে এলো আর একটি বই, নাম তা'র 'নারী ও রাজনীতি'। ইতিহাসের

যাত্রী

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-নীতির সঙ্গে এই বই-ই ঘটালো আমার প্রথম পরিচয়। আমার মন একেবারে বেঁকে বস্‌লো, কিছুতেই সে রাজী নয় এই নীতি মান্‌তে। মন রেগে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, বল্‌লো—এও কি কখনো সম্ভব যে মানুষের ইতিহাসে যা কিছু ঘটেছে ও ঘট্‌ছে তা' সবই অর্থনৈতিক কারণে ঘটেছে? এ কখনই হোতে পারে না, এ নীতি মানুষকে চার পায়ে হাঁটাতে চায়, সেটি কখনো হতে দেবো না, সেটা কখনো সত্যি নয়। বইটার কথা মান্‌তে পারছি নে অথচ বইটা ছাড়তেও পারছি নে। বার বার বইটা পড়লুম আর প্রত্যেকবারই মন ভীষণ রাগ করে চেঁচায়, ভড়কে দেয় আমাকে। রক্তের সঙ্গে মিশে-যাওয়া ধোঁওয়াশ্রয়ী 'আধ্যাত্মিক' সংস্কার যে এই নীতির ধাক্কা খেয়ে এ রকম কোরে চেঁচাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সংস্কার রেগে বুকের মধ্যে আঁচড়াতে লাগলো, বল্‌লে ফিস্‌ফাস্ কোরে—ভগবানকে তুমি মানো না অনেকদিন তা' জানি, কিন্তু তাই বলে মানুষের 'আত্মা' 'আধ্যাত্মিক দৃষ্টি' 'আদর্শানুরক্তি' এগুলোকে কি তুমি মানো না? শুধু স্বার্থের খাতিরে; অর্থনৈতিক চাবুকের তাড়নায় মানুষ তা'র সামাজিক ইতিহাস তৈরী কোরে আস্‌ছে এতো দিন, এই কথা তুমি বলতে চাও? চুপ কোরে রইলুম, আমি নিজেই তখন অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছি, তীর পাচ্ছি না, অন্যকে বল্‌বোই বা কি, বোঝাবোই বা কি! পরে যখন ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-নীতির যথার্থ ধারণা করতে পারলুম তখন বুঝলুম যে দুর্বুদ্ধি শত্রুর চেয়ে নির্বুদ্ধি মিত্র কম ভয়ঙ্কর নয়। দুর্বুদ্ধি শত্রুর চেয়ে কমিউনিষ্ট মতবাদের কম

ক্ষতি করে নি নির্বুদ্ধি মিত্র। জ্ঞানের অভাবে কমিউনিজমের যান্ত্রিক বিশ্লেষণ কোরে তা'রা কমিউনিজম্‌কে বিকৃত রূপে ধরে দিয়েছে লোকের সামনে। আমার ভাগ্য দোষে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-নীতির সঙ্গে আমার পরিচয় এই নীতির এম্‌নি একটি কাঠ-কাঠ যান্ত্রিক বিশ্লেষণ মারফৎ। কমিউনিজম্‌ কিম্বা ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-নীতি একথা কখনো বলে না যে একমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে মানুষ সব কিছু করছে কিম্বা ইতিহাসের ধারার মূল হচ্ছে নিছক অর্থনৈতিক মূল। এই বিকৃত ধারণার জন্য দায়ী কমিউনিজমের শত্রুদের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার আর কমিউনিজমের নির্বুদ্ধি বন্ধুদের কাঠ-মোল্লাগিরি।

কমিউনিজমের সঙ্গে আমার পরিচয় যখন সবে সুরু হয়েছে তখন রাশিয়া থেকে সদ্যপ্রত্যাগত শিবনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হোয়ে গেলো একদিন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। বিচিত্রা-ভবনে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন। আমি তাঁর ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় তাঁর ঘর থেকে একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ বের হয়ে এলেন। অপ্রত্যাশিত দেখার মতোই হলো আমাদের অপ্রত্যাশিত আলাপ। শুনলুম তাঁর কাছে তিনি আফগানিস্থান হোয়ে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, সেখানে এক বৎসর থাকবার পর ইয়োরোপে হোয়ে দেশে ফিরেছেন সম্প্রতি। তখুনি তাঁকে আমন্ত্রণ জানালুম যতো শীঘ্রি সম্ভব একদিন আস্‌তে। শিবনাথ এলো, তা'র কাছ থেকে কোঁচড় ভরে কুড়লুম রাশিয়ার খবর। শিবনাথ লেনিনকে দেখেছিলো, তাঁর বক্তৃতাও শুনেছিলো সে। ওর কথা শুনে মনে হতে লাগ্‌লো যে এতদিনে বুঝি একজন

লোক পেলুম যে বন্ধ দরজা খুলে নতুন জগতে প্রবেশ করবার মন্ত্র জানে। একদিন কথায় কথায় তার সঙ্গে তর্ক বেধে গেলো। অসহযোগ আন্দোলনের ও গান্ধীজির তীব্র সমালোচনা সুরু করলো সে, আমি কেন জানি না সহ্য করতে পারলুম না তা'র সমালোচনা। কথার বাণ কাটাকাটি চল্‌লো আমাদের দু'জনের মধ্যে অনেকক্ষন। তর্কের বিষয় ও কথা কাটাকাটি ঝাপ্‌সা হোয়ে গেছে মনে। তবু গান্ধীবাদের সমর্থনে আমি যে তর্ক করেছিলুম তা'র থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে গান্ধীবাদের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ তখনো আমি ছিন্ন কোরে উঠ্‌তে পারি নি। তখনো আমার মনের মধ্যে নতুন পথ জেগে ওঠে নি, শুধু তা'র সম্ভাবনার ইসারা পাচ্ছিলুম আমি মনের মধ্যে। শিবনাথের কাছেই আমার রুশীয় ভাষা শেখবার হাতে খড়ি হোলো। খুব অল্পদিন তা'র কাছে পড়েছিলুম কিন্তু তবুও অন্তত এ বিষয়ে সে আমার গুরুগিরি করেছে একথা মানতেই হবে। শিবনাথের পথ আর আমার পথ বহুদিন থেকে একবারে ভিন্নমুখিন। পথে চলার সময় আমরা দু'জনে দুজনকে মিষ্টি কথা পরিবেশন করি নি ও আদবেই রেহাই দিই নি, আর সেটা স্বাভাবিকও, বিশেষ করে যখন আমরা দুজনেই যা ধরি তা' সারা মন দিয়ে মুঠো করে আঁকড়ে ধরি। তবু সংঘাতের ধুলো ঝড় তোল্‌বার পর আবার যখন থিতিয়ে যায় পথের উপর, তখন চব্বিশ বছর আগের দিন মনে পরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে রাগের ধূলোও থিতিয়ে যায় মনে। আমার নিজের কথাই বল্‌ছি, কেন না শিবনাথের মনের খবর আমার জানা নেই।

কমিউনিজম্‌ সম্বন্ধে নানা বই পড়্‌তে পড়্‌তে শ্রেণী-সংঘাতের

অর্থ আমার কাছে সুস্পষ্ট হোয়ে এলো। বুঝলুম তখন বিপ্লবের মানে কি আর বিপ্লবের শক্তিই বা কোথা থেকে আসে। এতোদিনে 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো'র প্রতিপাদ্য বিষয় আমি ঠিক মতো বুঝ্‌তে পারলুম। শ্রেণী-সংঘাতের অপর নামই যে রাজনীতি, রাজনৈতিক ইতিহাস যে আসলে শ্রেণী-সংঘাতের ইতিহাস সেটা আমার কাছে পরিস্কার হোয়ে গেলো। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যে একটি শ্রেণী বিশেষের দল, শুধু সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করা ও স্বার্থ পুষ্ট করাই যে সেই রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য, এটা যখন বুঝ্‌তে পারলুম তখন গান্ধীবাদের আর কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিস্কার হোয়ে গেলো। গান্ধীবাদের উপর বিশ্বাস হারালেও এতো দিন সংশয়ের অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছিলো আমার মন। এবার সে পৌঁছলো গিয়ে কূলে। সবল পায়ে নিঃসংশয় মনে সোজা হোয়ে দাঁড়ালুম আমি কমিউনিজমের তীর-ভূমিতে। গান্ধীবাদের সঙ্গে আমার চির-কালের জন্যে ছাড়াছাড়ি হোয়ে গেলো।

এমন সময় একদিন ডাক এলো মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে আমার বর্ণদিদির কাছে থেকে। তাঁর দক্ষিণে যাবার সখ হোয়েছে, আমার উপর হুকুম হোলো তাঁকে নিয়ে যেতে হবে। তীরে পৌঁছবার জন্যে নিজের সঙ্গে এতো দিন যে লড়াই কোরে আসছিলুম তা'তে ক্লান্তি কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন কোরেছিলো আমাকে। দক্ষিণে যাবার সম্ভাবনা ঘটায় খুসি হলুম। নতুন পথে যাত্রা সুরু করবার আগে শরীর ও মন আলো বাতাসে ধুয়ে নেবার দরকার ছিলো। কতো ঘোরাই

না ঘুরলুম সেবার বর্ণদি আর আমি। ওয়ালটিয়ার, মাদ্রাজ, মহাবলিপুরম্ তাঞ্জোর, মাদুরা, ত্রিচিনোপলি, রামেশ্বরম্, সব ঘুরে ছিলুম সেবারে দু'জনে। মহাবলিপুরম্ যে কি ভালো লেগেছিলো তা বলে শেষ করতে পারি নে। লোকের বাস নেই বল্লেই হয়, দূরে জেলেদের গ্রাম, সেখান থেকে তা'রা আসে মহাবলিপুরমে। মন্দিরের পুরোহিত, লাইট্-হাউসের লোক আর জেলেরা, এ ছাড়া জনমনিষ্যি নেই সেখানে। কয়েকটি মন্দির সমুদ্র লুকিয়ে নিয়েছে ঢেউয়ের আঁচলের তলায়। তীরের উপর বালির আলিঙ্গনে বন্দী ছোট্ট একটি মন্দির। জোয়ারের সময় ঢেউয়ের হাত বাড়িয়ে দেয় সমুদ্র মন্দিরটিকে স্পর্শ করবার আগ্রহে। তীরের উপর পাইনের বন, যেন সমুদ্রের নীল ঢেউয়ের সঙ্গে রেশারেশি কোরে পৃথিবী সবুজ ঢেউ তুলেছে তীরের বুকে। মনে হয় যেন কতো শতাব্দীর স্বপ্ন এই মন্দিরটিকে ঘিরে রয়েছে। সারারাত আমি ঘুমোইনি, নির্জন বালির পথে চাঁদের আলোতে ঘুরে বেড়িয়েছি। এমন একটা স্বপ্নভরা জায়গা আমি আর দেখিনি কোথাও। এখানে এলে বর্তমানের সব খেই হারিয়ে ফেলে মানুষ। তারপরেও দু'বার আমি মহাবালিপুরমে গেছি আর দু'বারই আমার মনে হোয়েছে যেন আমি বর্তমানের সঙ্গে সব সম্পর্ক-হারা কাহিনীর অবাস্তব-পুরে এসে হাজির হোয়েছি।

দক্ষিণের মন্দিরগুলো স্থাপত্য-কলার অপূর্ব নিদর্শন। গোপুরম্ থেকে মন্দিরের গর্ভগৃহে যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, সে পর্যন্ত প্রত্যেকটি সৃষ্টি একই মূল ভাবের সূত্রে গাঁথা। গোপুরম দিয়ে ঢুকেই বিরাট প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গণের মধ্যে শিবের ষাঁড়ের প্রস্তর-

মূর্তি। তারপরে কয়েকটি ধাপ উঠে আর একটি প্রাঙ্গন, তারপর নাটমন্দির, তারপরে অন্ধকার গর্ভগৃহ যেখানে বিগ্রহ বিরাজমান। দীর্ঘপথ অতিক্রম কোরে ধাপের পর ধাপ উঠে মানুষ পৌঁছয় গিয়ে সেই অন্ধকার ঘরে যেখানে ভগবান আছেন। এই ভাবটিকেই মূর্তি দেবার জন্যে মন্দিরগুলি এই ভাবে তৈরী করা হয়েছে। বিরাট মন্দিরগুলোর অটল গাম্ভীর্য মনকে অভিভূত করে। স্থাপত্য-কলার নিদর্শন হিসেবে মন্দিরগুলো যতই ভালো লাগুক না কেন, মাদুরা তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপলি প্রভৃতি সহরগুলো যেন ধর্মের শিক দিয়ে তৈরী দম-বন্ধ-করা খাঁচা। সে যে কি এক অসহ্য আবহাওয়া এই সহরগুলোর! মন্দিরগুলো যেন থাবা দিয়ে মানুষগুলোকে টেনে নিয়ে চেপে রেখে দিয়েছে সংস্কারের পাথরের তলায়। ছেলে বুড়ো সবার কপালেই ফোঁটা, সবাই চলেছে মন্দিরের দিকে। মন্দিরে যাওয়া ছাড়া যেন আর কোন কাজ নেই। জীবনকে এরা যেন একেবারে সঁপে দিয়েছে মন্দিরের হাতে। ধর্মের এই অসহ্য গুমোটে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলো, মন্দিরগুলো দেখে কলকাতায় ফিরে এসে বাঁচলুম।

একদিন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়ে কলেজ স্কোয়ার-মুখো চলেছি, হ্যারিসন রোড আর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের কোণে ফিরিওয়ালাদের হাতে একটি নতুন কাগজ নজরে পড়লো। পত্রিকাটির নাম 'লাঙল'। নতুন ধরণের নামটি লাগলো ভালো। পত্রিকাটি নিয়ে বাড়ী ফিরলুম, পড়ে দেখলুম যে শ্রমিক-কৃষকদলের নাম দিয়ে একটি দল সৃষ্টি হোয়েছে, সেই দলেরই মুখপত্র হচ্ছে 'লাঙল'। তখুনি চিঠি লিখলুম 'লাঙলের' অফিসের ঠিকানায়।

দলের তরফ থেকে শ্যামসুদ্দীন সাহেব আমার সঙ্গে দেখা কোরতে জোড়াসাঁকোয় এলেন। তা'র দু'তিন দিন বাদেই আমি হাজির হলুম গিয়ে 'লাঙ্গলে'র আফিসে। ৩৭ নং হ্যারিসন রোডে একটি মেসের দোতলায় দু'টি ঘর নিয়ে শ্রমিক-কৃষকদলের ও 'লাঙলে'র আফিস ছিলো। মনে আছে সেই বিকেল্ বেলাটা। আমি গিয়ে হাজির হলুম সেখানে। তখন আমার খালি পা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরণে খদ্দর। ঘরের মধ্যে এক্‌টী ছোট্ট মানুষ বসেছিলেন, শরীর তাঁর কৃশ, মুখ বিবর্ণ। শ্যামসুদ্দীন সাহেব আলাপ করিয়ে দিয়ে বল্লেন ইনি হচ্ছে মুজফ্‌ফর আহমেদ। পাশের ঘর থেকে লম্বা রোগা একজন বেরিয়ে এলেন। আলাপ হলো, শুনলুম তাঁর নাম নলিনী গুপ্ত। এক্‌টি অল্পবয়সী ছেলে সেখানে বসেছিলো, শ্যামসুদ্দীন আলাপ করিয়ে দিয়ে বল্লেন—এ আমার ছোট ভাই, হালিম। প্রথম দিন মুজফ্‌ফ্‌রের সঙ্গে আলাপ হোলো। শ্রমিক-কৃষক দলের সম্বন্ধে আলোচনা করলুম দু'জনে। ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত তখন এই দলের সভাপতি, অতুল গুপ্ত সহ-সভাপতি আর হেমন্ত সরকার জেনারেল সেক্রেটারী। স্বরাজ পার্টির তখন নাভিশ্বাস উঠেছে, দেশবন্ধু চলে গেছেন, তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তক্তাউস দখল করবার জন্যে তখন নখদন্তের খুব জোরালো ব্যবহার চলেছে। সেই সময় হেমন্ত সরকার শ্রমিককৃষক দলে যোগদান করেন। দু তিন দিন বাদে আবার গেলুম 'লাঙল' অফিসে, সেদিন হেমন্ত সরকার আর নজরুল ইস্‌লাম এই দু'জনের সঙ্গে আলাপ হোলো সেখানে। হেমন্ত সরকার ছিলেন দেশবন্ধুর প্রিয় শিষ্য, তাঁর প্রধান সাকরেদ্ বল্লেও চলে। যেমন ছিলো তাঁর

খরধার বুদ্ধি, তেম্‌নি বলবার ক্ষমতা, তেম্‌নি রাজনৈতিক চালবাজীর পটুত্ব। এখনকার হেমন্ত সরকারকে দেখে সেদিনকার হেমন্ত সরকারের কোন ধারণাই কেউ করতে পারবে না। নজরুলের সঙ্গে আলাপ জমে গেলো। সে কবিতা পড়লো, গান গেয়ে শোনালে। আমিও তাকে গান শোনালুম। কি ভালোই লেগেছিলো নজরুলকে সেই প্রথম আলাপে! সবল শরীর; ঝাঁকৃড়া চুল, চোখ দুটি যেন পেয়ালা, কখনো সে পেয়ালা খালি নেই, প্রাণের অরুণ রসে সদাই ভরপূর। গলাটি সারসের গলার মতো পাৎলা নয়, পুরুষের গলা যেমন হওয়া উচিৎ তেম্‌নি, সবল, বীর্য-ব্যঞ্জক। গলার স্বরটি ছিলো ভারী, গলায় যে সুর খেলতো খুব বেশী তা' বলতে পারিনে, কিন্তু সেই মোটা গলার সুরে ছিলো যাদু। ঢেউয়ের আঘাতের মতো, ঝড়ের ঝাপ্‌টার মতো তা'র গান আছ্‌ড়ে পড়তো শ্রোতার বুকে। অনেক চিকণ গলার গাইয়ের চেয়ে নজরুলের মোটা গলার গান আমার লক্ষগুণ ভালো লাগতো। আমি তাকে ঠাট্টা কোরে বলতুম—অমন কাংসবিনিন্দিত সুরে গান নাইবা গাইলে নজরুল? সে দু'হাত দিয়ে তার গলাটিকে বেড়ে ধরে হেসে বলতো—কেন? এতোখানি গলা রয়েছে, তবু তুমি আমাকে গান গাইতে মানা করছো? এই বলে হা হা কোরে হেসে উঠ্‌তো। প্রাণ ছিলো তা'র ঐ হাসির মতোই সরল প্রবল ও দরাজ। এক ধরণের লোক আছে তাদের চেহারা কথাবার্তা হাবভাব সব ফ্যাকাশে। গোধূলির করুণ রঙে নিজেদের জাহির করবার তাদের কি অশ্রান্ত চেষ্টা। এইটেই নাকি কবি ও ভাবুকের ট্রেডমার্ক! ড্রইংরুমে আর মেয়েমহলে এই ট্রেডমার্ক

থাকলে নাকি খাতির অবশ্যম্ভাবী! এই অসহ্য মুখ-মেরে-দেওয়া মিঠে ভাব নজরুলের আদবেই ছিলো না। প্রবল হোতে সে ভয় পেতো না, নিজেকে মিঠে দেখাবার জন্যে সে কখনো চেষ্টা করতো না। রবীন্দ্রনাথের পরে এমন শক্তিশালী কবি আর আসেনি বাঙলা দেশে। এমন সহজ-গতি, আবেগের আগুন-ভরা কবিতা বাঙলা সাহিত্যে বিরল। সত্যেন দত্তের কবিতা এর তুলনায় আড়ষ্ট। একটি কৃত্রিম ছন্দ-সচেতনতা সব সময়েই রসাস্বদনে বাধা ঘটায় সত্যেন দত্তের কবিতায়। মনে হয় ভাবটিকে সচেতন ভাবে ছন্দের সাজ পরাণো হয়েছে। নজরুলের কবিতায় কৃত্রিমতার দুর্গন্ধ আদবেই নেই, মনের হিমাদ্রি থেকে ভাবের জমাট বরফ কল্পনার সূর্যালোকে গলে নেমে এসেছে দুর্বার ধারায়। ভাব নিজের ছন্দ নিজেই তৈরী কোরে নেমে এসেছে, ছন্দ সৃষ্টি করবার জন্যে তাকে প্রয়াস কোরতে হয় নি। 'লাঙলে' বের হোলো নজরুলের 'নারী' কবিতাটি। একদিনের মধ্যে 'লাঙল' সব বিক্রি হয়ে গেলো, সেই সংখ্যাটা আমাদের আবার ছাপ্‌তে হোলো। নজরুলের কবিতাই ছিলো 'লাঙলের প্রধান আকর্ষণ। যে সব প্রবন্ধ ছাপা হোতো সেগুলোর মধ্যে কমিউনিষ্ট মতবাদের ছোঁওয়া কিছু কিছু থাকলেও উগ্র জাতীয়তাবাদেই ঠাসা থাকতো প্রবন্ধগুলি। তাছাড়া কাঁচা মনের ছাপও কম থাকতো না লেখাগুলোতে। চালকেরা যে কি রকম কাঁচা ছিলেন তার একটি মজার উদাহরণ দিই। শ্রমিক-কৃষকদলের মুখপত্রে সুভাষচন্দ্রের কোষ্ঠীর ফলাফল-বিচার ছাপানো হয়েছিলো! আন্তরিকতা ছাড়া আমাদের সত্যি কোরে আর কোনো সম্বল ছিলো না সে দিন। আমি যোগ দিলুম এই দলে। রবীন্দ্রনাথের

কাছ থেকে 'লাঙলে'র জন্যে আশীর্বচন যোগাড় করবার ভার পড়লো আমার উপর। এক দিন সকাল বেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে পেশ করলুম আমাদের আর্জি। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে দিলেন—

"জাগো, জাগো বলরাম, ধরো তব মরু-ভাঙ্গা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।"

'লাঙলে'র প্রচ্ছদপটে তাঁর আশীর্বচন থাক্‌তো। এর কিছু-দিন পরে আমরা পত্রিকার নাম বদল কোরে তা'র নাম রাখলুম 'গণবাণী'। মুজফ্‌ফর্‌ হোলেন পত্রিকার সম্পাদক। এই 'গণবাণী'তেই আমি 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো'র অনুবাদ ছাপাই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের সেই প্রথম যুগের 'গণবাণী' গোষ্ঠীর একজন। নৃপেন এই সময়েই গর্কির 'মা' বইটির অনুবাদ সুরু করে আর তার কিছুটা অংশ সর্বপ্রথম ছাপা হয় গণবাণীতে। উনিশশো ছাব্বিশ সাল গড়িয়ে এলো। স্থির-হোলো দলের প্রথম কনফারেন্স কৃষ্ণনগরে করা হবে। কলকাতা থেকে মুজফ্‌ফর, ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত, অতুল গুপ্ত, কুতুবদ্দীন আহম্মদ ও আমি কৃষ্ণনগরে গেলুম। হেমন্ত ও নজরুল তখন কৃষ্ণনগরেই থাকতেন। কন্‌ফারেন্সের জন্যে গান লেখবার ফরমাস করা গেলো নজরুলকে। তাকে একটা ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ কোরে দিয়ে আদায় করলুম আমরা দুটি গান—'ধ্বংস-পথের যাত্রীদল,' আর 'ওঠ্‌রে চাষী জগৎবাসী ধর্‌ কসে লাঙল।' বাঙলা সাহিত্যে এই ধরণের গান ছিলো না এর আগে, নজরুলই তা'র পথকার। কৃষ্ণনগর সেদিন মৌচাকের মতো মুখর। শুধু যে আমাদের শ্রমিক-কৃষক দলের কন্‌ফারেন্স

হচ্ছিলো তা নয়, সেই একই সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্স ডাকা হোয়েছিলো কৃষ্ণনগরে। সরোজিনী নাইডু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন শাসমল প্রভৃতি কংগ্রেসী নেতারা সবাই সেবার হাজির কৃষ্ণনগর কন্‌ফারেন্সে। আমাদের কন্‌ফারেন্স হোলো কৃষ্ণনগর টাউন হলে আর জনসভা টাউন হলের মাঠে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্স হোলো কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে!

ইতিহাস এখানেও রসিকতা করতে ছাড়লো না। রাজবাড়ীতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সের দিকে আঙ্গুল দিয়ে কংগ্রেসের আসল রূপ দেখিয়ে দিলো সকলকে। সকালবেলা আমাদের কন্‌ফারেন্স স্বুরু হোলো। দলের গঠনতান্ত্রিক নিয়মাবলী ও কর্মসূচী গৃহীত হোলো এই কন্‌ফারেন্সে। অতুল গুপ্ত দলের সভাপতি নির্বাচিত হোলেন। বিকেলবেলা টাউনহলের মাঠে জনসভা স্বুরু হোলো নরেশ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে। তাঁর আর অতুল গুপ্তের কলকাতা ফেরার জরুরী দরকার ছিলো বলে নরেশবাবু আমাকে সভার সভাপতি কোরে দিয়ে চলে গেলেন। জনসভায় সেই আমার প্রথম আবির্ভাব। আমার যা অবস্থা! ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনি লাগে কোথায় আমার কাঁপুনির কাছে! চেয়ারে বসে আছি মনে হচ্ছিলো যেন চেয়ার থেকে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাবো মাটিতে। মিটিংএ বলা দূরে থাকুক, ইস্কুলে পড়বার সময় ইস্কুলের তর্ক-সভায় কিছু বল্‌তে আমার শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত শুকিয়ে যেতো। ইস্কুলে যখন পড়ি তখন আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়তো। তার নাম স্বুবোধ দাসগুপ্ত। স্বুবোধ কোমরে হাত দিয়ে আকাশের দিকে

চেয়ে খুব নাটকীয় ধরণে বক্তৃতা করতো। আমি অবাক হোয়ে তার বক্তৃতা শুনতুম আর ভাবতুম এও কি সম্ভব! কি অসাধারণ ক্ষমতা সুবোধের, আমার মুখে একটি কথা যোগায় না আর সুবোধ কিনা অনর্গল বক্তৃতা করে যায়! আমি তর্ক-সভায় বক্তৃতা করতে উঠ্‌লেই মাথার মধ্যে যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে এম্‌নি মনে হোতো। যা কিছু বলবো বলে ঠিক করেছিলুম সব যেতুম ভুলে, মাথার মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা, বুড়োর হাতের লাঠির মতো সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ কোরে কেঁপে অস্থির আর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরগুলোর উপর বার বার আছড়ে পড়তো, মনে হোতো যেন পাঁজরগুলো ঠেলে ঠুলে হৃৎপিণ্ডটা বাইরে ঠিক্‌রে পড়বে। আমি যে কখনো সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারবো এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কৃষ্ণনগরের মাঠে আমার সেই প্রথম বক্তৃতার কথা আমি কখনো ভুলবো না। কি যে দু' কথা বলেছিলুম তা আমার আদবেই মনে নেই। তবে আমার অবস্থা দেখে বোধ হয় শ্রোতাদের করুণা হয়েছিলো। চারদিক থেকে 'গান গান' ধ্বনি উঠ্‌লো, আমিও বাঁচলুম। দু'টি গান গেয়ে কোন মতে নিজের প্রাণ রক্ষে কোরে বসে পড়লুম। নজরুলও সেই মিটিংএ ছিলো, সে বক্তৃতাও দিলো, গানও গাইলো। কনফারেন্সের কাজ শেষ হোলে আমি আর কুতুবদ্দীন গেলুম নবদ্বীপ দেখ্‌তে। কুতুবদ্দীনকে ধুতি চাদর পরিয়ে নিয়ে গেলুম, কি জানি নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের রক্ত যদি মুসলমানকে দেখে গরম হোয়ে ওঠে! ললিতা সখির নাম অনেকদিন থেকে শুনে আস্‌ছিলুম, তাঁকে দেখবার কৌতূহল ছিলো মনে। আমি কুতুবকে নিয়ে তাঁর আস্তানায়

দিনেন্দ্রনাথ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ

হাজির হলুম গিয়ে। বারণ্ডায় বসে আছি কিছুক্ষণ এমন সময়ে শাড়ী-পরিহিত একটি স্থূলকায় লোক এসে আমাদের সামনে বসলেন। অঙ্গে কাঁচুলি ও শাড়ী, হাতে চুড়ি, চুল মেয়েদের মতো করে কপালের দু' পাশে পাতা কাটা। হাতের কব্জি চওড়া, বাহু দুটি আর যাই হোক মৃণাল বলে ভ্রম হবার কোনো উপায় নেই। আগেই শুনেছিলুম যে ললিতা সখী হবার আগে তিনি কুস্তি কোরতেন আর ললিতা সখী হবার পরেও একবার দাঙ্গার সময়ে লাঠি হাতে রাস্তায় নেমে বহু লোকেব মোহড়া নিয়েছিলেন। বাহুদুটি দেখে এ বিষয়ে সন্দেহ করবার অবকাশ রইলো না। কুতুবকে নির্বাক হোয়ে বসে থাক্‌তে বোলে আমি শুরু করলুম আলাপ ললিতা সখীর সঙ্গে। শুধালুম তাঁকে যে তাঁর ললিতা সখী নাম নেওয়ার অর্থ কি এই যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ললিতা সখীর যে সম্বন্ধ ছিলো তিনি নিজের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেই অনুরাগের বন্ধন অন্তরে অনুভব করেন? তিনি বল্লেন যে ঠিক তাই, তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই সখিভাব অনুভব করেন। বল্লুম যে তা'র জন্যে শাড়ী পড়বার প্রয়োজন ছিলো কি? যেটা অন্তরের অনুভূতি তা'কে এ ধরণের বাহ্যিক রূপ দেবার দরকার কি ছিলো? ললিতা সখি বল্লেন—আমি ছেলেমানুষ, আমি ছেলেমানুষ, আমি কি জানি, আমার গুরুকে জিজ্ঞেস করুন। এর পর যে প্রশ্নই করি না কেন এই একই জবাব তিনি দিতে লাগলেন। বুঝলুম আমার প্রশ্নের তাড়ায় খোলের মধ্যে মাথাটি ঢুকিয়ে নিয়েছেন ভদ্রলোক, আর জবাব পাওয়া যাবে না।

কলকাতায় ফিরে এলুম। দলের ভাগ্যে লক্ষ্মীর পদ্মের পাঁপ্‌ড়ির টুকরোও কোনো অনুকূল বাতাসে পড়ে না উড়ে

এসে। দম্‌কা হাওয়ার মতো আসে যায় ‘গণবাণী’। মুজফ্‌ফর্‌ নলিনীদের ভরা পেট খাওয়া খুব কমই জোটে, অনাহারের পালা লেগেই আছে প্রতি মাসে। আমার হাতেও টাকা নেই কিছু। সহকর্মীদের উপবাস, কাজের ক্ষতি, আমাকে অস্থির কোরে তুল্‌লো। হঠাৎ মাথায় এলো গানের আয়োজন করে অর্থ সংগ্রহ কোর্‌লে তো হয়! উঠে পড়ে লেগে গেলুম তোড়জোড়ের কাজে। এলবাট হলে ‘বসন্ত উৎসব’ অনুষ্ঠিত হোলো। নজ্‌রুল ইস্‌লাম, নলিনীকান্ত সরকার ও আরো অনেকে গান গাইলেন। আমিও ছিলুম সেই গায়কদের মধ্যে। যৎসামান্য হলেও কিছু টাকা এলো, অনাহার ও উপবাসের হাত থেকে কিছুদিনের মতো রেহাই পেলো মুজফ্‌ফরেরা। ‘গণবাণী’ আবার দেখা দিলো রাস্তার মোড়ে। তা’র অল্প দিন পরেই নানা ঋতুর গানের ফুল গেঁথে নিয়ে তৈরী করলুম সুরের মালা। তা’র নাম দিলুম ‘ঋতুচক্র’। এবারে গানের আসর বস্‌লো ইউনির্ভাসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে। হলের উপর নীচ ভরে গেলো লোকে। দেড় হাজারের চেয়েও বেশী টাকা পেয়েছিলুম সেবার। ঋতুচক্রের কথা মনে হোলেই মনে পড়ে রেবার নাচ। আমাদের দলের মধ্যেও কেউ জান্‌তো না যে রেবা নাচবে সেদিন সন্ধ্যের আসরে। রেবার বাবার অনুমতি চাইতেই তিনি দিয়ে দিলেন। এমনি উদার ও নির্ভীক লোক ছিলেন রেবার বাবা। কোন গানের সঙ্গে রেবা নাচবে সেটা ঠিক করে নিলুম রেবাতে আমাতে। উৎসবের শেষ গান—‘যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে’—সুরু হোতেই রেবা গানের দল

থেকে বের হোয়ে এলো উল্কার মতো ষ্টেজের মাঝখানে, গানের হাল্‌কা ছন্দের সঙ্গে সুরু কোরে দিলো চপল নৃত্য। প্রকাশ্যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বাঙলা দেশে রেবার আগে কোনো ভদ্রঘরের মেয়ে নৃত্য করেনি। রবীন্দ্রনাথও তখন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের দিয়ে নৃত্য অনুষ্ঠান করান নি। এর প্রায় বছরখানেক বাদে 'নটীর পূজা'য় রবীন্দ্রনাথ নৃত্যর অবতারণা করেন। এ বিষয়ে রেবা পথকারিণী। সেই সর্বপ্রথমে পথ দেখিয়েছে। এর জন্যে তাকে কম বিদ্রূপ ও অপমান সহ্য করতে হয়নি। অনুষ্ঠানের পরেই 'সঞ্জীবনী' থেকে শুরু কোরে সব সংবাদপত্রগুলি আমার ও রেবার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার সুরু কোরে দিলো। তার উত্তর স্বরূপ আমি আবার এক্‌টি নৃত্যগীতের আসর করলুম। এবার উৎসব হোলো আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ীর প্রাঙ্গনে। 'নূপুর বেজে যায় রিণি ঝিণি' এই গানটির সঙ্গে নাচ্‌লো চিত্রা, নন্দিতা আর সুমিতা। নীতিবাগীশদের কাঠমোল্লাইগিরির উত্তর দিলুম আমি সেদিন এমনি কোরে। নৃত্যের অনুষ্ঠান এক্‌টির পর এক্‌টি কোরে আমি এদের ধাক্কা দিয়ে যাবো এই ছিলো আমার সঙ্কল্প। তার স্বল্পকাল বাদে রঙ্গমঞ্চে ভদ্রঘরের মেয়েদের নৃত্যের প্রবর্তন করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নীতিবাগীশদের দাপট ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হোয়ে মিলিয়ে গেলো তাদের মনের ভীরু অন্ধকারের মধ্যে।

ছোট্ট আমাদের দলটি মতবাদও তার উগ্র জাতীয়তাবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তবুও কংগ্রেসী নেতাদের বিরূপতা ও বিরুদ্ধতার অন্ত ছিলো না। সেই প্রবল বিরুদ্ধতা উপেক্ষা

কোরে আমরা ক'টি লোক একটি নতুন সামাজিক আদর্শ প্রচারের কাজে লেগে গিয়েছিলুম। কুষ্টিয়া সহরে একটি কন্‌ফারেন্স হোলো। বহু জেলে সেই সভায় যোগদান করলো। অতুলচন্দ্র গুপ্ত সেই কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন। নজরুল, হেমন্ত সরকার ও আমি যোগদান করেছিলুম সেই কনফারেন্সে। টেরারিষ্ট দলগুলির উপর বীতশ্রদ্ধ হোয়ে কিছু লোক এই সময়ে আমাদের দলের দিকে সরে আসেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা কোরে দলের মধ্যে তাঁদের টেনে নেওয়া হয়। এই সময় বাঙলা দেশের বিভিন্ন টেরারিষ্ট দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করবার মত্‌লব আমার মাথায় আসে। চট্টগ্রাম, নদীয়া, ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলুম, উদ্দেশ্য ছিলো এই সব দলগুলির সাহচর্যে একটি কেন্দ্রিয় সংগঠন গড়া। টেরারিষ্ট দলগুলির পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ এতো অসম্ভব রকম বেশী ছিলো যে আমার চেষ্টা দলীয় ঈর্ষার পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে পড়লো। তবুও এই পরিচয়ের ফলে টেরারিষ্ট দলগুলি থেকে কিছু লোককে আমাদের দিকে টেনে আনবার সুযোগ আমরা পেয়েছিলুম।

শ্রমিক-কৃষক দল গঠন করবার উদ্দেশ্য ছিলো মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে টেরারিজম্‌ ও কংগ্রেসের আওতা থেকে সরিয়ে গণ-আন্দোলনের জোয়ারের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া। দেশের তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা যা ছিলো তাতে স্বাধীনতার তৃষা-কাতর মধ্যবিত্তকে কংগ্রেসের মরীচিকার মায়া থেকে বাঁচিয়ে বিপ্লবের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে নিয়ে আসবার

যাত্রী

পথে শ্রমিক-কৃষক দল ছিলো প্রথম সরাইখানা। আমরা অন্তত শ্রমিক-কৃষক দলকে এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হিসেবে দেখেছিলুম। বিপ্লবের আসল হাতিয়ার—কমিউনিষ্ট দল-তৈয়ারীর দিকে আমাদের পূরো নজরই ছিলো। শ্রমিক-কৃষক দলের রাজনৈতিক আবরণের তলায় কমিউনিষ্ট দল গঠন করবো এই ছিলো আমাদের সঙ্কল্প। আমরা করেছিলুমও তাই। বোম্বে, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, রাজপুতনা এ সব জায়গায় দু'একটি কোরে লোক ছিলো যারা কাণপুর কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র কেসের পরে কমিউনিজমের কাছে ঘেঁসে এসেছিলো। মুজফ্‌ফর, নলিনী, ডাঙ্গে, ওসমানী এঁরা সকলেই সেই প্রথম কমিউনিষ্ট-ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ও সবাই দীর্ঘ মেয়াদের পর মুক্তি পেয়েছিলেন। এঁরা তো ছিলেনই, আরো কিছু নতুন লোক এসে আমাদের সঙ্গে জোটে। এই নতুন লোকদের মধ্যে ছিলো একজন তার নাম ছিলো বাগরহট্টা। কলকাতায় এসে বাগরহট্টা জোড়া-সাঁকোয় আমার ওখানে ওঠে। তার কথা শুনলে মনে হোতো যে বিপ্লবের আর আদবেই দেরী নেই! ঝাঁকে ঝাঁকে কমিউনিষ্ট-পঙ্গপাল উড়ে এসে ক্যাপিটালিস্টদের মুনফাধর্মী সমাজের ক্ষেত উজাড় কোরে দিলো বলে! তার উৎসাহের প্রবল ধাক্কায় বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব হোয়ে উঠছিলো। কিছুদিন কলকাতায় থেকে বাগরহট্টা তার মুলুকে ফিরে গেলো। তার কিছুদিন পরে আমাদের কাছে বাগরহট্টা সম্বন্ধে যে খবর পৌঁছলো তার থেকে বুঝতে পারলুম যে তখনকার গভর্মেণ্টের গোয়েন্দা-বিভাগের রজতবারিধারার সিঞ্চনে বাগরহট্টায় প্রবল উৎসাহের তরু মঞ্জুরিত হয়েছিলো।

যাত্রী

ইউরোপের সঙ্গে আমাদের যোগ ছিলো তখন পণ্ডিচেরীর রাস্তা দিয়ে। আর সেই যোগ কতটুকুই বা ছিলো! কচিৎ কখনো মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিঠি এসে পৌঁছতো আর সেই চিঠি পাঠ করতুম আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। রায়ের লেখা দু' একটি পুস্তিকা আর তাঁর চিঠি এই ছিলো আমাদের সম্বল। আমরা তখন ছিলুম আশ্চর্য রকম কাঁচা, কিন্তু আমাদের একটা সৌভাগ্য ছিলো ; কমিউনিজম সম্বন্ধে নিজেদের স্বল্প জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত সচেতন ছিলুম। আর এই সচেতনাই নির্বুদ্ধিতার অপঘাত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলো আমাদের। এ যুগের আধুনিকেরা যে উৎকট কাঁচা-পাকামি রোগে অহরহ ভুগে থাকে সেই সর্বনেশে নির্লজ্জ রোগে আমরা কখনো ভুগি নি।

হঠাৎ একদিন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়ে গেলো। কিছুকাল অন্তর অন্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া ছিলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বজন-বিদিত নীতি। ধর্মের দোহাই দিয়ে, সম্প্রদায়ের নামে মানুষ যে কি রকম আচম্‌কা পশু বনে যেতে পারে তা' দেখলুম। শুনলুম মুসলমান চাকর পঁচিশ বছর হিন্দু মনিবের ওখানে কাজ করবার পর মনিবকে খুন করলো নিজের সম্প্রদায়ের লোক ডেকে এনে। শুনলুম মাড়োয়ারী ধনী তার ত্রিশ বছরের পুরোনো মুসলমান কোচোয়ানকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করলো। বহুকাল থেকে আবদুল ভিস্তি আমাদের বাড়ীতে কাজ করতো। মশকে জল ভরে ড্রেন নর্দমা ধোলাই করা ছিলো তা'র কাজ। বুড়ো আবদুল রোজ সকালে আস্‌তো। মশকের মুখ খুলে হাত দিয়ে চিপে ধরে তা'র জল ছিটানোর কায়দা দেখতে ভারী ভালো

লাগতো। আমার উপর তা'র স্নেহ ছিলো, আমাকে দেখলেই তা'র মুখ হাসিতে কুঁকড়ে যেতো। আমাকে সে মাঝে মাঝে মশকের মুখ চিপে ধরে জল ছিটোতে দিতো। তার খাটুনি বাড়্‌তো, আবার তাকে ভরতে হোতো মশক, তবু সে খুসি মনে মিটতো আমার আব্‌দার। দাঙ্গার সময় একদিন সকালে আব্‌দুল এসে মাটিতে আছড়ে পড়লো। পাড়ার সব লোক অনেক কাল থেকে তা'কে জানতো। তবুও সেদিন রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে সে যখন আমাদের বাড়ীতে আসছিলো, তখন হিন্দুরা তাকে ধরে দুটো কানের কিছু অংশ কেটে নিয়েছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ে তার কাঁচাপাকা দাড়িকে রাঙিয়ে দিয়েছে। আব্‌দুলের কান্না শুনে দৌড়ে এলুম নীচে। যা শুনলুম তাতে দুঃখে লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হোলো। বুড়ো আব্‌দুল, পল্লীর প্রতিটি লোকের চেনা সে, রাস্তায় কত লোক তা'র সঙ্গে হেসে কথা কইতো। আজ হঠাৎ এতোদিনের পরিচয় সব ভেঙে চূড়মার হোয়ে গেলো চীনে মাটির বাসনেব মতো! সাম্প্রদায়িক হানাহানি আব্‌দুলের আর সব পরিচয় লোপ করে দিলো নিমেষে, শুধু একটি মাত্র পরিচয় তা'র রয়ে গেলো যে সে মুসলমান! তার কান ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে, লোক সঙ্গে দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম। দিনরাত হল্লার আওয়াজ আসে, বিশেষ কোরে নিঝুম রাত্তিরে। একদিন দুপুরে ভীষণ হল্লা উঠ্‌লো আমাদের বাগানের পাঁচিলের ও ধারে সিংহী বাগানে। ত্রিশ চল্লিশজন মুসলমান হিন্দুদের তাড়া খেয়ে পাঁচিল টপ্‌কে লাফিয়ে পড়েছে আমাদের ভিতর বাড়ীর বাগানে। দরোয়ানরা লাঠি হাতে দৌড়লো তাদের মাববার জন্যে। দরওয়ানদের ধম্‌কে সরিয়ে

দিয়ে আমি তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে বসালুম আমাদের একতলার বারাণ্ডায়। বাগানের পাঁচিলের ওদিকে তখন ভীষণ হল্লা সুরু হোয়েছে। গিয়ে দেখি প্রায় ছ' তিন শো লোক জড়ো হোয়েছে। আমাকে দেখে চিৎকার সুরু হোলো—মুসলমানদের বের করে দাও নইলে আমরা জোর কোরে বাড়ীতে ঢুকবো। হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে পাঁচিল টপ্‌কে ঢুকলে তাদের কি অবস্থা হবে। কিছুক্ষণ হট্টগোল করে তা'রা সব চলে গেলো। আন্‌জুমানকে টেলিফোন কোরে গাড়ী আনিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিলুম। তার ছুদিন বাদে 'হানিফীতে' বের হোলো যে ঠাকুর বাড়ীর সৌম্যেন্দ্রনাথ অনেক মুসলমানকে বাড়ীতে আটক কোরে ফেলেছিলো, নেহাৎ খোদাতাল্লার কৃপা ছিলো বলে এই মুসলমানেরা অনেক কৌশল কোরে তা'র হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে। 'হানিফীর' সম্পাদক আমাদের শ্রমিক-কৃষক দলের অফিসে মাঝে মাঝে আসতেন। পরে দেখা হোতেই জিজ্ঞেস করলুম তাঁকে যে আমার সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাঁর কাগজে সেই খবরটি কোথা থেকে জোগাড় হোলো! তিনি হেসে বল্লেন আন্‌জুমান খবর দিলো আপনি অনেক কটি মুসলমানকে বাঁচিয়েছেন। অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে বলেও দিলো যে খবরটিকে বিকৃত কোরে কাগজে বের কোরতে, তাই কোরেছি ব্যবসার খাতিরে। অবাক হোয়ে শুনলুম তাঁর কথা। ব্যবসার খাতিরে জঘন্য মিথ্যে সত্য হোয়ে গেলো! আর সেই মিথ্যে পরিবেশন করা হোলো হাজার হাজার লোককে, তাদের মনে ঢেলে দেওয়া হোলো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ, সব শুধু ব্যবসার খাতিরে! কি চমৎকার সমাজ-ব্যবস্থাতেই না আমরা বাস করছি!

গণবাণীর এক বিশেষ সংখ্যা বের করলুম এই সময়ে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উপর লিখলুম আমি আর মুজফ্‌ফর। একদিন বিকেলে ৩৭ নং হ্যারিসন রোডে দলের অফিসে বসে আছি এমন সময় রাস্তা থেকে চীৎকার শোনা যেতে লাগলো—কালী মাইকি জয়। বারাণ্ডায় বের হোয়ে দেখি একদল কলেজের ছেলে হকি ষ্টিক, লাঠি, খাটের পায়া, যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে চলেছে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের দিকে। নেমে গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলুম তা'রা চলেছে কোথায়। শুনলুম ঠন্‌ঠনে কালীবাড়ী মুসলমানেরা আক্রমণ করবে খবর এসেছে। তা'রা সেই কালীবাড়ী রক্ষে করবার জন্যে চলেছে। বল্লুম কালীবাড়ী রক্ষে করুক ভালো কথা, কিন্তু এই জঘন্য খুনোখুনি বন্ধ করবার কোনো উপায় তা'রা ভেবেছে কি? তা'রা শুধোলে—আপনি কি বলেন? বল্লুম,—হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ছেলেদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরী করা দরকার। তা'রা রাস্তায় রাস্তায় পাহাড়া দেবে আর গুণ্ডা, খুনী অত্যাচারীদের কঠোর ভাবে দমন করবে। এছাড়া এই দাঙ্গা বন্ধ করবার কোন উপায় নেই। তা'রা শুনলে আমার কথা, কিন্তু উত্তরে বল্লে যে ও সব কথা শোনবার সময় এখন নয়। আগে মুসলমানদের সায়েস্তা করা যাক, পরে ও সব কথা ভাবা যাবে। 'জয় মা কালী,' 'কালী মাইকী জয়' চিৎকার কোরতে কোরতে তা'রা চলে গেলো। মাস খানেক ধরে এই বীভৎসতার স্রোত বইলো কলকাতার রাস্তাগুলিতে। লর্ড লিটনের গভর্মেণ্ট কিছুই কোরলো না, পুলিশও কোনো রকম বাধা দিলো না দাঙ্গাকারীদের। লর্ড লিটন দার্জিলিংয়ের তোফা আরাম ছেড়ে কলকাতায় নেমে এলেন না।

একমাস দাঙ্গা চলবার পরে তিনি কলকাতায় এলেন। একদিন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে দেখা হোলো। মিস ম্যাকলাউড আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি থাকতেন বেলুড় মঠে, আমি প্রায়ই যেতুম তাঁর কাছে। কথায় কথায় বল্লুম তাঁকে গভর্মেণ্টের উদাসীনতার কথা, শত শত লোক প্রাণ হারাচ্ছে দাঙ্গায়, আর লর্ড লিটন দার্জিলিংয়ে বসে বরফের হাওয়া খাচ্ছেন। তিনি বল্লেন তুমি একবার লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা কোরে সবটা বল না কেন তাঁকে। বল্লুম—লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা করে কি হবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি তিনি, তা'রাই তো এই দাঙ্গা লাগাচ্ছে। তাদের এজেন্টের সঙ্গে দেখা করে লাভ কি? মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গে লর্ড লিটনের খুব ভাব ছিলো। বেলুড়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে লিটনের দেখার ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি চুপ কোরে রইলেন; কিছু বললেন না। কয়েকদিন বাদে লর্ড লিটনের সেক্রেটারীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলুম, আপনি যদি অমুক দিন এসে গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করেন তো তিনি খুসি হবেন। আমার ইচ্ছে ছিলোনা, তাই লিখে পাঠালুম আমি কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছি এখন দেখা করার সুবিধে হবে না কয়েকদিন বাদে আবার একটা চিঠি এলো লিটন সাহেবের সেক্রেটারীর কাছ থেকে। সেদিন দুপুরে খালি পায়ে খদ্দর গায়ে হাজির হলুম গিয়ে গভর্মেণ্ট হাউসে। লর্ড লিটনের সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথা হোলো। বল্লেম তাঁকে, অন্য সময় পুলিশের জুলুমের অন্ত থাকেনা আর এখন দরকারের সময় পুলিশ কেমন নিস্ক্রিয়, তাদের সামনে হত্যা চলেছে তারা দাঁড়িয়ে দেখছে। তিনি চুপ করে সব শুনলেন, শেষে বল্লেন, পুলিশের সম্বন্ধে আপনার মত

আমি মানতে পারলুম না। সে তো জানাই ছিলো যে সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট লর্ড লিটন এটা মানতে পারবেন না। ইচ্ছে কোরলে তো দু' ঘণ্টার মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ কোরে দিতে পারতেন তিনি, তিনিই তো এই দাঙ্গাকে এক মাসের উপর চল্‌তে দিলেন। এখন কোন মুখে তিনি তাঁর নিজের কুকর্মের নিন্দে করেন! পর দিন বেলুড়ে গিয়ে মিস ম্যাকলাউডকে জানালুম সব। যেমন হঠাৎ সুরু হোয়েছিল একদিন, তেমনি হঠাৎ একদিন দাঙ্গা বন্ধ হোয়ে গেলো। বোঝা গেলো উস্‌কানেওয়ালা ও দাঙ্গালাগানেওয়াদের মনোস্কাম পূর্ণ হয়েছে। হিন্দু মুসলমান এক হোয়ে চলছিলো, এখন তাদের ভাগ কোরে দেওয়া হোলো হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কাঁটার বেড়া তুলে।

একদিন সকালে নলিনী এলো জোড়াসাঁকোয় বললে বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে একজন কমরেড প্রায় দু' মাস হোলো কলকাতায় এসেছে। এ দু মাস সে আমাদের সঙ্গে দেখা করে নি, শুধু ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছিলো। এখন সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার পরের দিন বৃটিশ কমরেডটিকে সঙ্গে নিয়ে নলিনী এলো জোড়াসাঁকোয়। শুনলুম কমরেডটির নাম ক্যাম্বেল। ক্যাম্বেল বল্লে যে পুলিশের নজর এড়াবার জন্যই সে এই দু মাস আমাদের সঙ্গে দেখা করেনি। এই দু মাস সে কিশোরী ঘোষ, শিবনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি নিছক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করেছে। প্রায় রোজই ক্যাম্‌বেল জোড়াসাঁকোয় আস্‌তো। বাগানের ধারের আমার একতলার ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের আলোচনা চল্‌তো। ইংলণ্ডে তখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যালঘুদের আন্দোলন

(মাইনরিটি মুভ্‌মেণ্ট) চালাচ্ছিলো বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি। সেই আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলো ক্যাম্‌বেল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কিছু জানলুম ও শিখলুম তা'র কাছ থেকে। বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কি উপায়ে আমরা যোগাযোগ রাখতে পারি সে বিষয়েও আমাদের আলাপ হোলো কিছুদিন। হঠাৎ একদিন সকালে নলিনী হন্তদন্ত হোয়ে ছুটে এলো আমার কাছে। শুনলুম ক্যাম্‌বেল সকালে গ্রেপ্তার হোয়েছে তার বাড়ী থেকে, আমাদের অফিসও খানাতল্লাসী করেছে পুলিশ। আমি আর নলিনী গেলুম ব্যাংকশাল ষ্ট্রীটের ফৌজদারী আদালতে। আমি জামিন হোয়ে ক্যাম্‌বেলকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম। ক্যাম্‌বেলের কাছে শুনলুম যে ভাটপাড়ার চটকল মজতুর ইউনিয়নের সেক্রেটারী কালিদাস ভট্টাচার্যের কাছে সে তার পাসপোর্ট রেখেছিলো। ভাট-পাড়ার ইউনিয়নের আফিস তল্লাসী কোরে পুলিশ পেঁয়েছে সেই পাসপোর্টটি আর জাল পাসপোর্ট নিয়ে ভারতবর্ষে আসার অভি-যোগে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। তার আসল নাম ক্যাম্‌বেল নয়, এলিসন, সেটাও জানলুম তখন। তারপরেও এলিসন প্রায় মাসখানেক কলকাতায় ছিলো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুলিশের মোটর তার পেছনে পেছনে ঘুরতো, সে কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে দেখবার জন্যে। আমরা তুজন প্রায়ই একসঙ্গে বের হতুম আর পুলিশের চরেরা ছুট্‌তো আমাদের পিছু পিছু। অনেকবার আমরা চরদের চোখে ধূলো দিয়ে সরে পড়েছি তুজনে। দেখতুম আমাদের খুঁজে হয়রান হোয়ে ছোটাছুটি করছে চরের দল। একদিন তুপুরে এলো এলিসন, আমার ঘরে ইজিচেয়ারে বসে খুব হাসতে সুরু করে দিলে।

যা শুনলুম তাতে আমারও হাসি চাপা দায় হোলো। এ্যালিসনের পেছন পেছন পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়ালো জোড়াসাঁকোর গলির সামনে। চর দু'টি এ্যালিসনকে গলিতে ঢুকতে দেখে নিশ্চিন্ত হোয়ে চোখ বুজেছে। এ্যালিসন অমনি ঘুরে গিয়ে তাদের গায়ের কম্বল দুটো ধরে দিলে টান। ঘুম গেলো ভেঙ্গে, ঝিমুনি গেল থেমে, তা'রা দু'জনেই মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুট, কম্বল দুটো নিয়ে চলে এলো এ্যালিসন। ট্রফি হিসেবে কম্বলদুটি দেখাতুম সকলকে। পরে আমার বুড়ো টেরিয়ার ফ্যাক্সির বিছানায় পুলিশের কম্বলের সদ্ব্যবহার হোলো। মাসখানেক বাদে এলিসনকে বম্বে নিয়ে গেলো। দু'বছর জেলে থাকার পর তাকে নির্বাসিত করলো ভারতবর্ষ থেকে। মস্কোয় আর বার্লিনে তার সঙ্গে আমার ফের দেখা হোয়েছিল।

'কালিকলম' গোষ্ঠির মধ্যে আমাকে টেনে আনলো আমার বন্ধু সুবোধ রায়। গল্প-লেখক ও সমালোচক হিসেবে সে সুখ্যাতি পেয়েছিলো রসিক-সমাজে। কর্ণওয়ালিশ মার্কেটের দোতলায় ছিলো 'বরদা এজেন্সী'। এই বইয়ের দোকানের সত্বাধিকারী শিশিরবাবুর আর্থিক সাহায্যে মাসিক পত্রিকা 'কালিকলম' জন্মলাভ করে। প্রেমেন মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মুরলীধর বসু আর সুবোধ রায় এই চারজন তরুণ সাহিত্যিকের যৌথ সম্পাদনায় পত্রিকাটি বের হয়। শালের উল্টো পিঠটার মতো জীবনের যে দিকটা সেলাই-বের-করা সে দিক্‌টার ছবি সর্বপ্রথম এঁরাই এঁকে ধরেন সবার সামনে। সমাজের নীচের তলার লোকদের জীবনের কাছে ঘেঁসে এসে, নিবিড় ভাবে সেই জীবনকে দেখে ও

অনুভব করে এঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তাঁর চারিত্রিক হোলো রিয়ালিজম্। কি অপূর্ব গল্প আর কবিতাই না সে সময়ে লিখেছিলেন প্রেমেন মিত্র আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শৈলজানন্দ তাঁর প্রতিভাকে তখনো মজুরো খাটাবার কাজে লাগান নি। এমনি আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে সত্যিকার কলাবিদ্ একে তো অতি বিরল, এলো একজন প্রতিভাবান গল্প-লেখক সে এমনি কোরে আত্মহত্যা করলো। নজরুলও লিখতো 'কালিকলম' পত্রিকায়। সিন্ধু নামে তার দুটি অপূর্ব কবিতা এই সময় ছাপা হয় 'কালিকলমে'। আমি লিখলুম 'নরনারী' নামে দু'টি প্রবন্ধ। হাওড়ায় সাহিত্যসভায় পঠিত 'সাহিত্য' প্রবন্ধটিও প্রকাশিত হোলো। স্বরচিত গান ও কেন্দুলী মেলায় সে সব বাউলের গান সংগ্রহ কোরেছিলুম তাও কিছু কিছু ছাপালুম। 'বরদা এজেন্সীর' সামনের ছাদে আমার বৈঠক বসতো। সুবোধ, প্রেমেন, শৈলজানন্দ, নজরুল, মুরলীধর ও আমি আলাপ-আলোচনায় গানে গল্পে মস্‌গুল হোয়ে কতো সন্ধ্যা কাটিয়ে দিয়েছি সেখানে। 'আমার 'নরনারী' প্রবন্ধ দু'টি খেপিয়ে দিলো নীতি-বাগীশদের। সমালোচনার যে ছুরি দিয়ে এঁরা আমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করতে চেষ্টা করলেন, সে ছুরি ছিলো অসম্ভব ভোঁতা। তাই নিছক ব্যথা দিলো এদের সমালোচনা, বিঁধতে পারলো না আমাকে। আমার 'সাহিত্য' প্রবন্ধটি খেপিয়ে দিলো বন্ধু নজরুলকে। এই প্রবন্ধে সাহিত্যিক রস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে নজরুলের দু'একটি কবিতার স্থূলতা, মাংস-বহুলতা ও রস-বিকৃতির সমালোচনা করেছিলুম। কবিতা যে দেহের এ্যানাটমি শেখাবার জন্যে নয়, ওর জন্যে যে মেডিকেল কলেজে

যাওয়াই প্রশস্ত, এই শ্লেষটুকু ছিলো আমার সমালোচনায়। নজরুল উঠ্‌লো ক্ষেপে, আমাকে ব্রাহ্ম বলে বিদ্রূপ সুরু করলে। একদিন সন্ধ্যে বেলা আমাদের সেই ছাদের মজলিশে ছিলুম আমি, সুবোধ আর নজরুল। আর কে কে ছিলেন তা' ঠিক মনে নেই। নজরুলের সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক বেধে গেলো। রসের সংযম সে মানতে রাজী ছিলো না। রসের সংযমকে সে নীতিবাগীশের আনুষ্ঠানিক সংযমের নামান্তর মাত্র বলে তর্ক করতে লাগলো। রসের গাদ বাদ দেওয়া যে রসেরই খাতিরে আর রস-সৃষ্টির জন্যে যে সেটার একান্ত দরকার, এটা সে কিছুতেই মান্‌তে রাজী হোলোনা। এই স্থূলতাই শেষ পর্যন্ত নজরুলের কবিতার সমাধি রচলো। বিশ্ব-সাহিত্যের কথা দূরে থাক, নিজের দেশের সাহিত্যের খবরও সে খুবই কম রাখতো। একবার প্রায় জোর করে বল্লেই হয় রবীন্দ্রনাথ তাকে কালিদাসের কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। মনের ইন্‌টেলেকটুয়াল পরিধি খুব সংকীর্ণ হওয়াতে কবিত্বের তরু বিচিত্র উপাদানের মধ্যে শিকড় মেলে দিতে পারল না। একটু গভীরে গিয়েই সে ধাক্কা খেলো অজ্ঞানতার পাথরে।

ইয়োরোপ থেকে ফিরে আসবার পরে একদিন চলেছি হেঁটে বিবেকানন্দ রোড দিয়ে। হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ফিরে দেখি নজরুল। অবাক্‌ হোয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। চুল তৈল-মসৃণ, গায়ে ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী, সিল্কের চাদর, পরণে চিকণ ধুতি, হাতে আংটি। বিশ্বাস করা শক্ত ছিলো যে এ নজরুল। হায়রে, বজ্র পরলো বাবুর সাজ, ভুল্‌লো তার গুরু গম্ভীর গর্জন, সুরু করলো নকল করতে

কিনা নূপুরের ধ্বনি! ঝড় কিনা সাজলো ঝালর-দেওয়া টানা পাখার সাজে! ভুল্‌লো কিনা সে দিগন্তের কপোল স্পর্শ করবার তৃষ্ণা ড্রইংরুমচারিণীদের কপোল পরশ করবার লোভে! আমাকে অমন করে তাকিয়ে থাকতে দেখে নজরুল বল্‌লে—কেন তাকিয়ে আছো অমন কোরে? বল্লুম, এই দেখা না হলেই ছিলো ভালো। যে নজরুলকে আমি জান্‌তুম, ভালো বাসতুম, যে নজরুল ছিলো আমার বন্ধু, সে এ নয়। এ নজরুল গ্রামফোন কোম্পানীর গোলামীর তক্‌মা পড়েছে চোখে মুখে সর্বাঙ্গে। বাজারে কদর হোক না কেন তার গানের, বেশীর ভাগ গান শ্যাওলার মতো ভাস্‌ছে জলের উপরে, মনের গভীরতাকে স্পর্শই করেনা। লক্ষ্মীর পাণ্ডাদের বায়নার জালে সরস্বতীর পূজারী যদি ধরা দেয় তা'হোলে তার এই অবস্থাই হয়। তাকে মনে করিয়ে দিলুম বহুকাল আগের এক সকালের কথা। সেদিন সকালে আমি আর নজরুল দুজনে গিয়েছিলেম রবীন্দ্রনাথের কাছে। নজরুলকে তার স্বরচিত গান শোনাতে বল্লেন রবীন্দ্রনাথ। নজরুল গাইলো 'চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংস-পথের যাত্রীদল' আর 'শিকল পরা ছল'। রবীন্দ্রনাথ খুসী হলেন গান শুনে। নজরুল চলে যাবার পর আমাকে বল্লেন—নজরুলের নিজস্ব একটি জোরালো ধরণ আছে। সেদিন দু'চারটি কথার পর নজরুলকে বল্লেন—শুন্‌ছি তুমি নাকি মন-যোগানো লেখা লিখতে সুরু করেছো? বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তরোয়াল হাতে, সে তরোয়াল কি তিনি তোমার হাতে দিয়েছেন দাড়ি চাঁচবার জন্যে? রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি নিয়ে নজরুল একটি কবিতা লিখেছিলো। তার কবিতা প্রমাণ করলো যে সে রবীন্দ্রনাথের কথার অর্থ ধরতে

পারেনি। তার পরে আর একবার মাত্র দেখা হোলো নজরুলের সঙ্গে। হেমন্ত সরকার নিমন্ত্রণ করেছিলেন আমাকে আর নজরুলকে তাঁর বাড়ীতে। গল্প হোলো, গানও হোলো কিন্তু দুজনেই বুঝলুম যে সুর আমাদের আলাদা হোয়ে গেছে, মিলছে না কোথাও। সেই আগেকার দিনের মজলিশের কথা মনে পড়লো। কতো জায়গায় নলিনীকান্ত সরকার, নজরুল আর আমি গান গেয়েছি। কতো দুপুর, কতো সন্ধ্যে কাটিয়েছি আমরা গানে গল্পে মশগুল হোয়ে। সে দিনের সুরের খেই একেবারে হারিয়ে গিয়েছিলো। আমাদের সেই শেষ দেখা। এতো বড় শক্তিমান কবি, এতো সে দিয়েছে দেশকে আর তা'র কিনা ভালো করে চিকিৎসা হোলোনা অর্থের অভাবে! এমন একজন ডাক্তার জুটলো না এই দেশে যে নজরুলের চিকিৎসা করবে অর্থের খাতিরে নয়, নজরুল যা দিয়েছে আমাদের তারি জন্যে ভালো-বাসার কৃতজ্ঞতায়। চল্‌তে চল্‌তে 'কালি কলম' থেমে গেলো এক দিন অর্থাভাবে। তবুও স্বল্প-আয়ু এই পত্রিকা একটি তার জুড়ে দিয়ে গেলো বঙ্গ-সাহিত্য-বীণাপাণির বীণায়, যার সুর পরবর্তী কালে সাহিত্যিকদের সৃষ্টির পথ দেখিয়েছে। এই সময়ে একবার আমার ডাক পড়লো হাওড়ায় সাহিত্য সভায়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ছিলেন সেই সভার সভাপতি! আমি পাঠ করলুম সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ। 'কালিকলম' পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি ছাপা হোয়েছিলো। এই প্রবন্ধে আমি সমালোচনা করি কালিদাসের কবিতার। দীনেশ সেন মহাশয় সে দিন আমাকে তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করলেন। মহাকবি কালিদাসের সমালোচনা করবার ধৃষ্টতা রাখে কিনা এক যুবক! এই ছিলো তাঁর বক্তব্যের

সারাংশ। তিনি যে আমাকে শিশুকাল থেকে দেখেছেন সে বিষয়েও অনেক কিছু শোনালেন। শুধু আমার বক্তব্যের খণ্ডনে কি যুক্তি আছে সেটা কাউকে জান্‌তে দিলেন না। আজও আমি কালিদাস সম্বন্ধে সেই একই মত পোষন করি। অপরূপ বর্ণনা আছে তাঁর কাব্যে, কিন্তু বেশীর ভাগ কবিতায় মাংস নিয়ে এতো বেশী ঘাঁটাঘাঁটি আছে যে মনকে পীড়া দেয় সে মাখামাখি, তৃপ্তি দেয় না। দেহ ও মনের মধ্যে রসের অনির্বচনীয় সেতু রচনা করতে পারেন নি মহাকবি, 'ঋতুসংহারে' তো নয়ই এমন কি 'মেঘদূতে'ও নয়। খুব অল্পই কবিতা আছে যাতে রসের সিঞ্চনে দেহ মন হোয়ে গেছে অনুভূতির অনির্বচনীয় লোকে।

আমার দিনগুলি তখন এম্‌নি কোরেই কেটেছে। গান, সাহিত্য, বাঁশী, রাজনীতি, সব নিয়েই আমি তখন ভরপূর। আমার প্রাণশক্তি ছিলো অপর্যাপ্ত, অন্তরের নিঃস্বতার ক্লান্তি আমি কখনো অনুভব করিনি। বাগানের ধারের আমার একতলার দক্ষিণের ঘরে দিন রাত আনাগোনা চল্‌তো বন্ধু বান্ধবদের। কতো ধরণের লোক আস্‌তো, রাজনীতির বন্ধুরা, সাহিত্যের সাথীরা, গানের দোসরেরা। আমার গানের মজলিস ছিলো তখন রেবা, লীলা প্রভৃতি বন্ধুদের বাড়ীতে আর আমার পিস্‌তুতো ভাই দাদা মহীমোহনের ওখানে। বৌঠাকরুণ ছিলেন মজলিসী লোক, হাসিখুসি মানুষটি। আমাদের অনেক উৎপাত সইতেন, নিজে হাতে রেঁধে আমাদের খাওয়াতে তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। তাঁর তেতলার ছাদে বসতো আমাদের গানের আসর। কৃষ্ণচূড়ো গাছটির লাল ফুল ছুঁতো এসে ছাদের কোন, যেন গান শোনার কৌতূহলে সে ঝুঁকে রয়েছে ছাদের দিকে। বিকেলের শেষ

আলো মিলিয়ে যেতো সন্ধ্যের আবছায়ায়, সন্ধ্যাতারা জ্বল্‌জ্বল্ করতো আকাশে। আমি গানের পর গান গেয়ে যেতুম সুরের নেশায় ভরপুর হোয়ে। সে আসরের নিত্য সাথী ছিলেন বড় বৌঠাকরুণ আর মেজ বৌঠাকরুণ। মাঝে মাঝে আসতেন দাদা মহীমোহন আর তিলোত্তমা।

সেবার ভাদ্রমাসে আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ীর প্রাঙ্গনে হোলো 'শেষ বর্ষন'। লাল বাড়ীতে (বিচিত্রা ভবনে) থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ঘরের পাশে বিরাট কদমগাছ ফুলে ফুলে ভর্তি। প্রতিদিন নতুন গান তৈরী হচ্ছে। দিনের মধ্যে কতোবার দৌড়ে আস্‌তো তাঁর ভৃত্য বনমালী আমাকে তলব করতে। তাঁর কাছ থেকে গানগুলো শিখে নিয়ে অন্যদের শিখিয়ে দিতুম। এই সময় একটি মুসলমান ওস্তাদের কাছে আমি শিক্ষা করছিলুম দরবারী সঙ্গীত। কয়েকটি সুর লাগলো ভালো, শোনালুম সেই গানগুলো রবীন্দ্রনাথকে। সেই সুরগুলির ছাঁচে ঢেলে তিনি তৈরী করলেন —'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে বাজে'; 'কার বাঁশী নিশি ভোরে বাজিলো' আর 'বন্ধু রহ রহ সাথে।' একদিন গভর্মেণ্ট হাউস থেকে সংবাদ এলো বেলজিয়ামের রাজ এলবার্ট ও তাঁর রাণী কলকাতায় এসেছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গীতানুষ্ঠান দেখতে আস্‌তে চান। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নিমন্ত্রন করলেন 'শেষ বর্ষণে'র একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। সে দিনকার উৎসবে আমি যোগ দিলুম না। রাজা রাণী আর লাটসাহেবকে গান শোনাবো আমি! কাকা রথীন্দ্রনাথ আমাকে ডেকে বল্লেন যে সে দিনকার অনুষ্ঠানে আমার যোগদান না করাটা ভালো দেখাবেনা। আমার আপত্তির কারণ তাঁকে জানিয়ে দুপুর থেকেই আমি বাড়ী থেকে বের হোয়ে

গেলুম। অনেক রাতে যখন বাড়ী ফির্‌লুম তখন এলবার্ট ও তাঁর রাণী চলে গেছেন, উৎসব শেষ হোয়ে গেছে। ‘‘বিসর্জন’ নাটকের অভিনয়ের আয়োজন সুরু হোলো বাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে আমি জয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করি। তাঁর ইচ্ছে ছিলো যে তিনি নিজে নেবেন রঘুপতির ভূমিকা। তিনি নিজে আমাকে তালিম দিয়েছিলেন কয়েকদিন। পরে বনেদী পরিবারের পারিবারিক জীবনে ঈর্ষার যে পঙ্কিল স্রোত বয় সেই স্রোত মুখর হোলো আমাকে ঘিরে। আমি সরে দাঁড়ালুম। রবীন্দ্রনাথ নিজে নিলেন জয়সিংহের ভূমিকা আর দিনেন্দ্রনাথ রঘুপতির। অভিনয়ের দিক থেকে বিসর্জন আমার মনে বিশেষ কোনো দাগ রেখে যায় নি। রঘুপতির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথের আর গুণবতীর ভূমিকায় আমার কাকী সংজ্ঞা দেবীর অভিনয় হোয়েছিলো অনবদ্য। জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় আমার বিশেষ ভালো লাগেনি। তিন দিন অভিনয় হোয়েছিলো এম্পায়ার থিয়েটারে আর তিন দিনই আমি আটক ছিলুম ষ্টেজের মধ্যে। অভিনেতাদের কথার খেই ধরিয়ে দেবার ভার ছিলো আমার।

টেরারিষ্ট দলগুলির সঙ্গে আমার যোগাযোগের কথা আমি আগেই বলেছি। ঢাকায় গিয়ে শ্রীসঙ্ঘের অনিল রায়, লীলা নাগ (বর্ত্তমানে লীলা রায়) ও অন্য অন্য দলের লোকদের সঙ্গে আমি দেখা করি। ডাঃ ভূপাল বসু তখন ঢাকাতেই আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও আমার দেখা হলো। কলকাতায় তখন টেগার্টের অপ্রতিহত দাপট। তা’কে সরাবার জন্য নানা দলের নানা প্রচেষ্টা চলেছে। আমি নিজে টেরারিষ্ট দলভুক্ত কখনো

ছিলুম না। কিন্তু এই দলগুলির বহু কর্মীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিলো। তাই এদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ যখন বল্লে যে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে আমার একতলার ঘরে আমি যদি ওদের বোমা তৈরী করতে দিই তাহোলে তাদের কাজের খুব সুবিধে হয়, আমি রাজী হলুম। রবীন্দ্রনাথ কিম্বা আমার পিতা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন যে তাঁদের বাড়ীতে বোমা তৈরী করা হচ্ছে টেগার্টকে মারবার জন্যে! কয়েকদিন ধরে আস্তে আস্তে জিনিষ-পত্তর সঞ্চিত হোলো আমার ঘরে। বুড়ো হরিচরণ অনেক কাল থেকে আমাদের বাড়ীতে ফরমাস মাফিক পিতলের নানা জিনিষ তৈরী কোরে দিতো। তাকে দিয়ে পিতল ঢালাই করিয়ে বোমার খোল তৈরী করিয়ে দিলুম ছেলেদের।

রাত্তির বেলা দু'তিনটি ছেলে এসে হাজির হোতো, এটা ওটা মিশিয়ে তা'রা তৈরী করতো বোমা, আমি সাহায্য করতুম সাধ্যমত। ঘরের মেজেতে আর আমাদের হাতে লাগলো হলুদে ছাপ। বারুদের গন্ধ ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসকে এমন করে জড়িয়ে ধরলো যেন সেই নাছোড়বান্দা গন্ধ ঘর ছেড়ে যেতে রাজী নয়। এ্যালিসন তখনো কলকাতায়, সেও ঘরের কোণে ইজিচেয়ারটিতে হেলান দিয়ে বসে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখতো। এমনি কোরে কিছু কিছু জিনিষ তৈরী হোলো, বাড়ী থেকে চলেও গেলো তৈরী জিনিষগুলো। জাহাজের একটি লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিলুম একজন বন্ধু মারফৎ। তার কাছ থেকে রিভলবার সংগ্রহ কোরে যোগান দিলুম এই ছেলেদের। টেগার্টকে মারবার জন্যে যে দল যা কিছু সাহায্য চেয়েছে আমি তাই দিয়েছি তখন। রোজ রাত্তিরে ছেলেরা আসতো

জোড়াসাঁকোয়, নিস্তুতি রাতে সুরু হতো বোমা তৈরীর কাজ। একদিন রাত্তিরে ঘরে আমরা তিন চারজন। বোমা তৈরীর কাজ সুরু হোয়ে গেছে, ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি। তখন রাত প্রায় দশটা। এমন সময় ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো নলিনী, বল্লে, হ্যারিসন রোডে আমাদের দলের অফিস খানাতল্লাসী করছে পুলিশ, সেখান থেকে জোড়াসাঁকোয় আসবার খুবই সম্ভাবনা আছে। মুহূর্তের জন্য মনে হোল যেন শরীর অবশ হোয়ে গেছে। এতো রাত্তির, এতো জিনিষপত্তর চারিদিকে ছড়ানো, এখন করি কি! তখুনি দারোয়ানকে দিয়ে ট্যাক্সি ডাকিয়ে ট্যাক্সিতে সব জিনিষ-পত্তর উঠিয়ে চলে গেলুম ষ্ট্রাণ্ডের দিকে গঙ্গার ধারে। চলন্ত ট্যাক্সি থেকেই সব জিনিষপত্তর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম গঙ্গার দিকে। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এলুম। পুলিশ কিন্তু এলো না সে রাত্তিরে। এলে কিন্তু রক্ষে ছিলো না, আমাদের হাত আর ঘরের মেজে সাক্ষী দিতো আমাদের বিরুদ্ধে।

এই সময়ে আমার আলাপ হয় সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে। সন্তোষ তখন কিছুটা ঘেঁসে এসেছে আমাদের শ্রমিক-কৃষক দলের দিকে। যুগান্তর দল থেকে বের হোয়ে এসে সে তখন নিজের একটি দল তৈরী করেছে। সংগঠন করবার ক্ষমতা ও রাজনৈতিক কূট-নীতির দক্ষতা সন্তোষের ছিলো। সুভাষচন্দ্র ও যতীন সেনগুপ্তর মধ্যে তখন নেতৃত্ব নিয়ে যে লড়াই চলছিলো তাতে সে ছিলো সেনগুপ্তর পক্ষে। সন্তোষ প্রায়ই আস্‌তো জোড়াসাঁকোয়, সঙ্গে আস্‌তো তার বন্ধু ও সহকর্মী ধীরেন। ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় ধীরেন প্রাণ হারায় কলকাতার রাস্তায়। সন্তোষ তখনো ব্যক্তিমূলক সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসবান ছিলো। আমি

তাকে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করে দিয়েছিলুম তখন। অর্থের অভাবে সব দলগুলিই পঙ্গু হোয়ে ছিলো আর অর্থ ছাড়া অস্ত্র যোগার করা সম্ভব ছিলো না। অর্থ যোগার করবার নানা ফন্দি আঁটতে লাগলো সন্তোষ। একদিন এসে বল্লে যে সে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জুটিয়েছে। আমি সই করে নিলে সে টাকা দিতে প্রস্তুত আছে। বল্লুম, আমার সইতে সে দেবে কেন? ঠাকুরদাদা, পিতা সবাই রয়েছেন, আমার তো কোনো অধিকারই নেই সম্পত্তিতে। সন্তোষ বল্‌লে যে জোড়াসাঁকো বাড়ী দেখিয়ে লোকটির কাছ থেকে টাকা ধার করা শক্ত হবেনা। মনে খট্‌কা থাকলেও আমি রাজী হলুম। একদিন সকালে সন্তোষ সেই লোকটিকে নিয়ে হাজির করলে আমার কাছে। কেন জানিনে সে নিজেই রাজী হোলোনা টাকা দিতে, আমিও বাঁচলুম। সন্তোষ প্রায়ই আসতো, বাগানে ঘাসের উপর বসে আমরা দুজনে জল্পনা কল্পনা করতুম। আমি গান গাই, বাড়ীতে অভিনয় হোলে সেই অভিনয়ের আসরে যাই, এইটে সন্তোষ আদবেই পছন্দ করতোনা। মনে আছে তখন 'নটীর পূজা' অভিনয় হচ্ছে আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ীর প্রাঙ্গনে। সেই দিনই বিকেলে সন্তোষ এসে হাজির। বল্লুম তাকে, আজ আমাকে ছুটি দিতে হবে। আজ বাড়ীতে 'নটীর পূজা' অভিনয়। সে ক্ষুব্ধ হোলো, আমাকে ভৎর্সনা করে বল্‌লে—একি বিপ্লবীর উপযুক্ত কাজ! অভিনয় দেখবে, গান শুনবে, এ সবের সময় কি আজ? বললুম, এসথেটিক দুর্বলতার আরকে ভিজে মন যখন নরম স্যাত্‌স্যাতে হোয়ে গিয়েছিলো তখন আমি নিজেই এসব বর্জন করেছি নিজের মনকে ঋজু, দৃঢ়, বীর্যবান

করবার জন্যে। আজ আমার এই বর্জনের প্রয়োজন নেই। আজ গান, কবিতা, অভিনয়, কোনো কিছুর সাধ্য নেই আমাকে বিপ্লবের পথ থেকে সরায়। বরঞ্চ যখনি গান শুনি, অভিনয় দেখি, কবিতা পড়ি তখনই মনের মধ্যে বিদ্রোহ ফণা তুলে গর্জায়, সংকল্প প্রবল হোয়ে ওঠে যে কবে সকলের জন্যে এই আনন্দ পরিবেশন করা সম্ভব হোয়ে উঠবে! তখন এই সমাজ-ব্যবস্থাকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেবার জন্যে মনের আকাশে বিদ্রোহের কালো মেঘ ঘনীভূত হয়। সন্তোষ স্বীকার করলো না আমার যুক্তি, আরো কঠিন বাক্যবাণ ছুঁড়তে লাগলো আমাকে আঘাত করবার জন্যে। টেরারিষ্ট ঐতিহ্যে মনের টুঁটি চেপে সমস্ত রস চুঁইয়ে দিয়ে তাকে কঙ্কাল করবার জোর নির্দেশ ছিলো। বিপ্লবের শিখায় মনকে জ্বালিয়ে নেবার আগে এই শুষ্কতা-সাধনার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যখন মালা বদল হোয়ে গেলো সেই শিখার সঙ্গে তখন শুষ্কতার উপর ঝোঁক এই দুর্বলতাকে চিরন্তন বলে মেনে নেওয়ার সামিল। আমি এই দুর্বলতাকে অপরাজেয় বলে মান্‌তে আদবেই রাজী ছিলুম না। সন্তোষ আমাকে প্রীতির চোখে দেখ্‌তো, তা'ছাড়া আমার চেহারায় ও হাবভাবে তখন বোধ হয় রসের দুর্বলতার ছাপ কিছু কিছু ছিলো যা' দেখে সে শঙ্কিত হোয়ে আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করতো। আমার মন কিন্তু তখন নিঃসংশয় ভাবে গ্রহণ করেছে বিপ্লবকে। গান, কবিতা, কোনো কিছুকে ভয় করবার কোনো কারণ ছিলোনা তার। আমি তখন ইয়োরোপে যখন হিজ্‌লী বন্দী-নিবাসে মরলো সন্তোষ ঘাতকদের গুলিতে।

'নটীর পূজা' অভিনয়ের কথা বলছিলুম। সে যে কি অপূর্ব

অভিনয় তা' যে না দেখেছে তা'কে বোঝানো শক্ত। ডাকঘর অভিনয়ের পরে এমন অভিনয় আর হয় নি। রাণী সেজেছিলো মালতী, শ্রীমতী সেজেছিলো গৌরী আর বৌদ্ধ ভিক্ষু সেজেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন অভিনয় করেছিলো মালতী, তেমনি অভিনয় করেছিলো গৌরী। যখন আমাদের ফটকের মধ্যে দিয়ে প্রভু বুদ্ধের জয়স্তুতি করতে করতে রবীন্দ্রনাথ প্রাঙ্গনে এসে ঢুকলেন আর সেখান থেকে ষ্টেজে উঠে গেলেন তখন প্রবল ভাবের জোয়ারে আমার সমস্ত শরীর থর্‌থর্ কোরে কাঁপতে লাগলো। গৌরী তাঁর পায়ের কাছে প্রণতা, তিনি আশীর্বাদ করছেন বৌদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ কোরে—সে ছবি আমি ভুল্‌তে পারবোনা এ জীবনে। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় আমার এই শেষবারের মতো দেখা। তা'র অল্পদিন পরে আমি ইয়োরোপে চলে যাই।

দলের কাজ এগোচ্ছিলো নেহাৎ মন্দাক্রান্তা ছন্দে। প্রবল বিরূপতা ও বিরুদ্ধতার উজান ঠেলে আমাদের এগোতে হচ্ছিলো। তা'র উপরে লেগেই ছিলো অর্থাভাবের মহামারী। যে সামান্য টাকা সংগ্রহ করেছিলুম 'বসন্ত উৎসব' ও 'ঋতু চক্র' করে, সে টাকায় কত দিনই বা চলে? জেল থেকে বের হোয়ে আসবার পর নলিনী আর মুজফ্‌ফর দুজনেরই শরীর ভাল ছিলোনা। তাদের চিকিৎসাও হচ্ছিলোনা উচিতমত। খাবার যা জুটছিলো তা' খেয়ে সুস্থ লোকেও সুস্থ থাকতে পারেনা। কি কষ্টই যে করেছে মুজফ্‌ফর আর এরা তা বলে শেষ করা যায় না। অনেক-দিন হোলো মুজফ্‌ফর আর আমি সরে গেছি পরস্পরের থেকে। তা'র চলার ছন্দের সঙ্গে আমার চলার ছন্দের আদবেই মিল নেই।

রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে সে আর আমি পরস্পর-বিরোধী শক্তি। আমি ষ্টালিনবাদ ও ষ্টালিনবাদীদের ঘোর শত্রু। ষ্টালিনবাদকে আমি হিটলার ও নাৎসীবাদের চেয়ে কম হিংস্র বলে মনে করিনা। আর মুজফ্ফর এই ষ্টালিন ও ষ্টালিনবাদেরই উপাসক। তবুও পঁচিশ বৎসর আগের সেই দিনগুলোকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আর সেই কারণেই আমাদের তুজনের মধ্যে সে দিন যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিলো তা'র শিকড় মনের মাটি থেকে একেবারে উপ্ড়ে ফেলে দেওয়াও সম্ভব নয়। মুজফ্ফর হয়তো পেরেছে ; আমি পারি নি।

শ্রমিক-কৃষক দলের দ্বিতীয় কনফারেন্স করবার আয়োজন হোতে লাগলো। ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ হলে আমাদের কন্ফারেন্স হয়। আমি ছিলুম অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সেই কন্ফারেন্স দলের নিয়মাবলীর কিছু অদলবদল করা হোলো আর আমি নির্বাচিত হলুম দলের জেনারেল সেক্রেটারী। কন্ফারেন্সের শেষ দিনের অধিবেশনের শকলৎওয়ালা এসে বক্তৃতা দিলেন। কনফারেন্সের তু' দিন আগে শকলৎওয়ালা কলকাতায় এসে পৌঁছন। আমাদের কাছে খবর পৌঁচেছিলো তাঁর কলকাতায় আসবার। মুজফ্ফর আর আমি ঠিক করলুম যে আমরা তুজনে রামরাজতলায় গিয়ে শকলৎওয়ালার সঙ্গে দেখা করবো। সেখান থেকে হাওড়ায় আসতে যে সময়টুকু লাগবে তার মধ্যে আমাদের বক্তব্য তাঁকে জানিয়ে দেবো আর আমাদের কন্ফারেন্সে আসবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করবো এই ছিলো আমাদের বাসনা। রামরাজতলায় গিয়ে বম্বে মেলের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিনলুম

আমরা থার্ড ক্লাসের টিকিট। তার উর্দ্ধে ওঠবার মতো টাকার মই ছিলোনা আমাদের। ট্রেণ এলো, সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় শকলৎওয়ালা ছিলেন। আমরা ছুটিতে উঠলুম তাঁর কামরায়, সুরু করলুম কথাবার্তা। ট্রেণ ছে'ড়ে দিতে না দিতে উঠ্‌লো এসে টিকিট চেকার। ছু'টি থার্ড ক্লাস টিকিট বের করে দিলুম আমরা, কতো দণ্ড হোলো মনে নেই। তবে সে যাই দণ্ড হোক না কেন সে দণ্ড চুকবার মতো সামান্য পয়সাও আমাদের পকেটে ছিলো না। আমি আর মুজফ্‌ফর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি দেখে শকলৎওয়ালা আমাদের অবস্থা বুঝলেন। পকেট থেকে একটি নোট বের করে চেকারের হাতে দিয়ে বল্লেন—আমি এদের ডেকেছিলুম। লজ্জায় আমার দম বন্ধ হোয়ে যাওয়ার সামিল, কোথায় শকলৎওয়ালাকে অভ্যর্থনা করতে এলুম, আর শেষে কিনা তাঁরই পকেট ছিদ্র করলুম আমরা দুজনে! আমরা যে কি নিঃস্ব ছিলুম তা' এর থেকেই বোঝা যাবে। ট্রেণ এসে হাওড়ায় থামলো। বিপিন পাল মহাশয় এগিয়ে এসে শকলৎওয়ালাকে অভিনন্দন জানালেন। বড়বাজারের পুরুষোত্তম রায় একদল মজুর নিয়ে হাজির ছিলো প্ল্যাটফর্মে। আমাদের সহকর্মীরা হাজির ছিলো লাল নিশান নিয়ে। শকলৎওয়ালা লাল নিশানটি টেনে নিয়ে গাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে নিশান দোলাতে লাগলেন। কি ভিড় তখন কলকাতার পার্কে পার্কে, টাউন হলে শকলৎওয়ালার বক্তৃতা শোনবার জন্যে। কি অসাধারণ ছিলো তাঁর বক্তৃতার ক্ষমতা! ছোট্ট মানুষটি, হাসি-মাখা মুখ, দরদ-ভরা চোখদুটি। কিন্তু যখন বল্‌তে সুরু করতেন তখন মনে হোতো যেন আগুনের ঝরণা ঝরে পড়ছে। সেদিন রাত্তিরে আমাদের কন্‌ফারেন্সে তিনি

প্রায় ঘণ্টা খানেক বক্তৃতা দিলেন। ভারতবর্ষে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে ঝড় তুলে দিয়ে চলে গেলেন শকলৎওয়ালা। তাঁর আগে গান্ধীবাদকে এরকম খোলাখুলি আক্রমণ কেউ করেনি আমাদের দেশে। ১৯২৭ সালে শকলৎওয়ালার সঙ্গে আমার আবার দেখা হোলো মস্কোতে। নভেম্বর-বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে তিনি এসেছিলেন। তার পরে বার্লিনে তাঁর সঙ্গে কয়েকবার দেখা হোয়েছে। তখন থেকে আমাদের চিঠিপত্র বিনিময় সুরু হয়, দেশে ফিরে আসবার পরেও তাঁর কাছ থেকে প্রায়ই চিঠি পেতুম। তাঁর মৃত্যুতে আমি একজন বন্ধু হারালুম, আর কমিউনিষ্ট-আন্দোলন হারালো একজন একনিষ্ঠ কর্মী।

টেরারিষ্ট-আন্দোলনের সঙ্গে আমার যোগ থাকে মুজফ্ফর এটা পছন্দ করতোনা। তা'র ভয় ছিলো যে আমি হয়তো এই নিষ্ফল রোম্যান্টিসিজমে গা ভাসিয়ে দেবো কমিউনিজমের পথ থেকে সরে গিয়ে। এ ভয়ের কোনই হেতু ছিলোনা। টেরারিষ্ট দলের কর্মীদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, সততা, সাহস ও দেশের প্রতি ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। আমার শ্রদ্ধা ছিলো মানুষগুলির উপর, বিশ্বাস কিন্তু কখনো ছিলোনা তাদের ব্যক্তি-মূলক ত্রাসবাদের পন্থার উপর। গান্ধীবাদ থেকে আমি সোজা-সুজি কমিউনিষ্ট মতবাদে পৌঁছই। গণ-আন্দোলনের সংস্পর্শে এসেই আমার রাজনৈতিক চেতনার জন্মলাভ ও বিকাশ। সে চেতনা ব্যক্তিমূলক ত্রাসবাদের সংকীর্ণতার কাছে কখনো আত্ম-সমর্পণ করেনি। গণ-শক্তির বিরাট বিস্তৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর টেরারিজমের অতি সংকীর্ণ পরিধির মোহে ধরা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো। টেরারিষ্ট দলগুলির সঙ্গে আমার

যোগাযোগের ছু'টি কারণ ছিলো। রাজনৈতিক ব্যবসাদার এরা কখনো নয়। এদের যদি টেনে নিতে পারা যায় আমাদের শ্রমিক-কৃষকদলে, এরা যদি আমাদের মতবাদ গ্রহণ করে তা' হোলে আমাদের দল শক্তিশালী হে.য়ে উঠ্‌বে এই ছিলো আমার বিশ্বাস। টেরারিষ্ট দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ফলে কিছু লোককে টেনেও নিতে পেরেছিলুম আমাদের দলে। তা'র বিপদ যে ছিলোনা তা' নয়। টেরারিষ্ট দলগুলির সঙ্গে আমার এই ঘনিষ্ঠতা পুলিশের মনে আমাদের দল সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাতে পারে এই আশঙ্কাও যথেষ্ট ছিলো, হলোও তাই। জোড়াসাঁকোর গলির মোড়ে আর আমাদের অফিসের নীচে গোয়েন্দা বিভাগের চরেরা ভন্‌ভনাতে লাগলো সকাল সন্ধ্যে। আমার সম্বন্ধে পুলিসের সন্দেহ ক্রমশঃই ঘন হোয়ে উঠ্‌লো। প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের বাড়ীর কোনো যোগাযোগ ছিলোনা। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইংরেজ শাসকদের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন বটে তবুও তাঁদের চরিত্রে আর একটা দিক ছিলো যার জন্যে তাঁরা সুধীসমাজে সম্মান পেয়েছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংগীত বিষয়ে তাদের অনুশীলন ছিলো গভীর, অনুরাগও ছিলো। বঙ্গ-সাহিত্যের বহু দুস্থ সাধকদের তাঁরা সাহায্য করেছিলেন ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন শুধু ইংরেজ শাসকদের উপর সীমাহীন ভক্তি আর তাঁবেদার-সুলভ আনুগত্য, আর কিছু নয়। আমরা কখনো প্রদ্যোতকুমারের ওখানে যেতুম না, তিনিও আসতেন না। এই ধরণের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আমাদের পরিবারের স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিলো। গভর্মেণ্ট

হাউসে আসাযাওয়ায় আর রাজকর্মচারীদের খাতির করার কাজেই প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের দিন কাটতো। পুলিশ কমিশনর টেগার্ট ছিলো প্রদ্যোতকুমারের দোস্তদের অন্যতম। বাগানবাড়ীর প্রমোদ-উৎসবে টেগার্ট কখনো বাদ পড়তো না। আমার কার্যকলাপ সম্বন্ধে টেগার্ট প্রদ্যোতকুমারকে বলে, আর সে যে আমাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবে তা'ও জানায়। আমার জ্যাঠামহাশয় গগনেন্দ্রনাথকে সব কথা জানিয়ে দেন প্রদ্যোৎকুমার। আমি তখন কুমিল্লায়, কুমিল্লা থেকে ফিরে এসে দেখি বাড়ীর শান্ত আবহাওয়ার সরোবরে কে যেন পাথরের টুক্‌রো ফেলেছে, চঞ্চল হোয়ে উঠেছে আবহাওয়া। আমার পিতা আমাকে ডেকে সব কথা বল্লেন। বুঝলুম ব্রিটিশ সিংহী তা'র ল্যাজের ঝাপ্‌টায় আমাকে লোহার গারদের পেছনে পাঠাবার মতলব করেছে। দলের অফিসে এসে মুজফ্‌ফর আর নলিনীকে ব্যাপারটা সব জানিয়ে দিলুম। দু'টি পথ খোলা ছিলো তখন, গরাদের পেছনে চলে যাওয়ার সরু সড়ক আর দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সুদূর ও অজানা রাস্তা। স্থির করলুম যে দেশ ছেড়ে ইয়োরোপে যাবার জন্যে চেষ্টা করে দেখা যাক। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তখন আমাদের কোনো যোগ ছিলোনা বল্লেই চলে। মাঝে মাঝে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিঠি আগুণের ফুল্‌কির মতো উড়ে এসে পড়তো আমাদের হাতে আর কচিৎ কখনো নানা আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে খবর এসে পৌঁছতো ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির থেকে। শুধু অনুরাগের মালমশলা দিয়ে বিপ্লবপন্থী দল তৈরী করা যায় না, তা'র গঠনে অনেক রকমের উপাদান লাগে। সে সব তখন আদবেই ছিলোনা আমাদের। যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে

সেই সব উপাদান সংগ্রহ কোরে আনতে পারি, নিজেকে তৈরী করতে পারি ভারতবর্ষের বিপ্লবের কাজের জন্যে তা' হোলো অনেক এগিয়ে যাবে আমাদের কাজ, এই ছিলো আমার ধারণা। মুজফ্‌ফর ও নলিনী সায় দিলো আমার মতে। শুধু শুধু জেলে আটক থেকে কি হবে? যদি রাশিয়ায় চলে যাওয়ার কোনো পথ খোলা থাকে তো তা'র চেয়ে ভালো আর কিছু হোতে পারেনা। এই হোলো আমাদের তিনজনের সিদ্ধান্ত। বাড়ী এসে পিতাকে বল্লুম যে আমি যদি ইয়োরোপ চলে যাই তা হোলে কেমন হয়? ইয়োরোপে যাওয়ার পেছনে যে কি উদ্দেশ্য গোপন রয়েছে তা' অবিশ্যি তাঁকে জানালুম না। তিনি তখুনি সায় দিলেন। বোধ হয় আশ্বস্ত হোলেন ভেবে যে জেলের হাত থেকে আমি বেঁচে গেলুম, হয় তো এও ভাবলেন যে ইয়োরোপে গেলে আমার মনের ধারা অন্য পথ দিয়ে বয়ে যেতেও পারে। আমার চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক হবে জেনেও তিনি শুধু আমাকে জেলে থেকে বাঁচাবার জন্যে সম্মতি দিলেন। লেগে গেলুম আমি যাবার জন্যে তোড়জোড় করবার কাজে। আমার মতো লোকের পক্ষে পাসপোর্ট পাওয়া দুরূহ ছিলো। আজও যেমন সেদিনও তেমন পাসপোর্ট নির্ভর করতো পুলিশের রিপোর্টের উপর। পুলিশ কমিশনার আর গোয়েন্দা-বিভাগ দেশ শাসন কর্‌তো, ইংরেজ গভর্ণর উঠ্‌তো বস্‌তো এদেরই ইঙ্গিতে। পুলিশ কমিশনর টেগার্ট ছিলো বাঙলা গভর্মেণ্টের কায়েদে আজম। পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত পেশ করবার কয়েকদিন পরেই তলব এলো লালবাজার পুলিশ হেড কোয়াটারসেতে

হাজির হোতে পাসপোর্টের জন্যে। পাসপোর্ট পেয়ে গেলুম, বুঝলুম আমাকে জেলে না পূরে দেশ থেকে সরিয়ে দিতে চায় টেগার্ট। পরে বোধ হয় তা'র আপশোষের অন্ত ছিলোনা, কোন ভুলে সে পাসপোর্ট দিলো আমাকে! ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস, সব আয়োজন সারা কোরে আমি তৈরী। জাহাজ ধরবার জন্যে আমাকে কলম্বো যেতে হবে। কাপড়ের টুক্‌রোর উপর দলের হুকুমনামা তৈরী হোলো। দল যে আমাকে মস্কো পাঠাচ্ছে তা'র প্রতিনিধি স্বরূপ, সেটা লেখা ছিলো সেই কাপড়ের টুক্‌রোতে। সেই টুক্‌রোটি টুপির মধ্যে ঢুকিয়ে সেলাই কোরে নিলুম। মুজফ্‌ফর, নলিনী আর আমি, আমাদের ত্রয়ীর বৈঠক বস্‌তো প্রায় রোজই। আমার সহকর্মীরা আমার চেয়ে কম উত্তেজিত ছিলোনা আমার যাওয়া সম্বন্ধে। দিন ঘনিয়ে এলো, জাপানী জাহাজে যাবো ঠিক করেছিলুম। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট ছিলো আমার। একটি পরিচিত যুবক ইয়োরোপে যাবার জন্যে খুব উদ্‌গ্রীব ছিলো, কিন্তু কিছুতেই বাড়ীর অমত কাটিয়ে উঠ্‌তে পারছিলো না। আমার সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট বদলে দুটো থার্ড ক্লাস টিকিট কিনে তাকেও সঙ্গে নিলুম। যাবার দিন যতো ঘনিয়ে আস্‌তে লাগলো ততো বাড়তে লাগলো অস্থিরতা আমার মনের মধ্যে। যে বিরাট অজানা সমুদ্রে আমি ঝাঁপাতে চলেছিলুম তার ঢেউকে আমার কোনো ভয় ছিলোনা। অজানা কখনো আমাকে ভয় দেখাতে পারেনি। আমি বুঝতে পারছিলুম যে এবার আমার চরম ছাড়াছাড়ি হবে অতীতের সঙ্গে। সেই অতীতের উপর যেখানে ছুরি পড়বে সেটা বিঁধবে গিয়ে আমার পিতার বুকে।

সুধীন্দ্রনাথ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ

আমার চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে হবে মৃত্যুদণ্ড। তবু উপায় ছিলো না। আগে প্রতিদিন বিকেল বেলা তিনি বেড়াতে বের হোতেন। বাড়ী ফিরতেন রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ। কিছুকাল থেকে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছিলো, বাড়ী থেকে খুব কদাচিৎ বের হোতেন। ক্রমশ যেন সব কিছু ছেড়ে নিজেকে একলা কোরে নিচ্ছিলেন। আমার ইয়োরোপ যাবার আগে তিনি প্রায়ই আমাকে ডেকে নিতেন তাঁর ঘরে। চুপটি কোরে শুয়ে থাক্‌তেন কৌচে, আমি বসে থাকতুম তাঁর মাথার কাছে তক্তপোষে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন দু'চারটি কথা। বুঝতে পারছিলুম তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছেন। যাবার দিন এলো, বৈশাখের সে এক রৌদ্র-দগ্ধ দিন। বিকেলের গাড়ীতে মাদ্রাজ যেতে হবে, সেখান থেকে যেতে হবে কলম্বো জাহাজ ধরতে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলুম। ইয়োরোপ সম্বন্ধে অনেক কথা বল্লেন। প্রণাম কোরে বিদায় নেবার আগে যে কথাটি বলেছিলেন সেটি আজও মনে আছে—গুরুর পেছনে ছুটিস্ নে। তোর ভিতরে যে গুরু আছেন তাকে জাগ্রত কর্। তখন দেখবি লোক আপনি আসবে তোর কথা শুনতে। পিতা তাঁর ঘরে কৌচে বসেছিলেন, তাঁর কাছে এসে বসলুম। তিনি দু'তিনবার বললেন—তুমি তো দু'এক বছরের মধ্যেই ফিরে আস্‌বে, তাই না? আশ্বাস দিলুম তাঁকে, কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি কেন তিনি একথা বারবার আমাকে শুধোলেন। পরে বুঝেছিলুম যে এ পারের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ শেষ হোতে বেশী দেরী নেই এটা তিনি বুঝেছিলেন। তাই বোধ হয় তাঁর

যাত্রী

একান্ত ইচ্ছে ছিলো যে আমার সঙ্গে তাঁর যেন দেখা হয় শেষ খেয়ার আগে। প্রণাম করলুম, কিছু বললেন না। শুধু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এলেন দেউড়ী পর্যন্ত। গাড়ীতে উঠলুম, ফিরে দেখলুম তখনো তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন—শীর্ণ মুখ, চোখ দুটি শান্ত, বেদনায় ভরা। সব কিছুর মধ্যে থেকেও মানুষ যে কেমন করে একলা হোয়ে যায় তা' তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝলুম। একলার এমন অসহ্য ও নিবিড় রূপ আমি আর কখনো দেখিনি। এ জীবনে সেই শেষ বারের মতো তাঁকে দেখলুম। একদিন বিকেলে কলম্বো থেকে জাহাজ ছাড়লো। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দেখলুম ভারতবর্ষের তীর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো ঢেউয়ের মধ্যে। মনে হোতে লাগলো সারা দুনিয়ায় কেউ যেন নেই, শুধু আমি আর এই পাগল নীল ঢেউগুলো। একটা অসহায় নিঃসঙ্গতা আচ্ছন্ন করলো আমাকে! শুধু মনের চোখে ভাসতে লাগলো বৈশাখের সেই বিকেল বেলাটি। দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন বুড়ো মানুষটি, চারিদিকে চলাচল, শুধু একা তিনি যেন পাথর হোয়ে গেছেন। এ পৃথিবীর হোয়েও তিনি যেন এ পৃথিবীর সঙ্গে সব দেনাপাওনার সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছেন। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছি রেলিং ধরে। সমুদ্রের নোনা হাওয়া ঝাপটা মারছে চোখে মুখে, বিদ্রূপের হাসির মতো আঘাত করছে আমাকে এসে। আমিও যেন পাথর হোয়ে গেছি। নীল সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজ এগিয়ে চললো অন্ধকারের দিকে।